সাহিত্য
ও
আলোচনা

শান্তি কুমার দাশগুপ্ত

অধ্যাপক, সিটি কলেজ

কলিকাতা

নিউ এজ পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৫৭

মূল্য—দুই টাকা মাত্র

প্রকাশক :

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

মুদ্রাকর :

শক্তি কুমার দাশগুপ্ত

আইডিয়াল প্রেস

৬৫নং বাজে শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া।

পরম পূজনীয় পিতা—

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের

শ্রীচরণে-

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

— সূচী —

প্রথম ভাগ :

সাহিত্য ১
উপন্যাস ৫
রোমাণ্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্ ১৭
বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ ২৫
ষ্টাইল ৩১
হাস্যরস ও কমলাকান্ত ৩৭

দ্বিতীয় ভাগ :

বঙ্কিমচন্দ্র ৪৯
রবীন্দ্রনাথ ৬৪
শরৎচন্দ্র ৭৭
তারাশঙ্কর ৮৮

— শুদ্ধিপত্র —

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
শিল্পিদের	শিল্পীদের	৪	২৪
সম্মুথে	সম্মুখে	৮	৯
,	।	১৩	৭
ক্ল্যাসিসিজম্	ক্ল্যাসিসিজম্-এ	১৭	১৪
অন	অন্য	২১	২৮
বস্তুগুলি	বস্তুগুলি	২৮	২৪
বস্তুর	বস্তুর	২৮	২৫
কেন কিছুর	কোন কিছুর	৩৫	১৬
আকষিত	আকর্ষিত	৪০	২২
উর্দ্ধে	উর্দ্ধে	৪৯	১০
পাপিষ্টা	পাপিষ্ঠা	৬০	১১
আনন্দরূপমমৃত	আনন্দরূপমমৃতম্	৭০	১২
তলিয়া	তুলিয়া	৭৫	১৯
প্রভেদ	প্রবেশ	৭৭	১০
উহাদের উভয়ের	উহাদের	৮৫	১৭
উর্দ্ধে	উর্দ্ধে	৮৮	১৬
কর্দ্দমে	পঙ্কে	৯১	২৩

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

প্রথম ভাগ

BAGHBAZAR READING LIBRARY
CALCUTTA

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভাললাগা, মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়-বৃত্তির বিচিত্ররসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।"

আমাদের এই হৃদয়-বৃত্তির রসে জারিত হইয়া বাহিরের জগৎ এক নূতন রূপ ধারণ করে। সাহিত্যে সেই রূপেরই প্রকাশ। তাই বাহিরের জগৎ কাঠামো হইলেও সাহিত্যের জগতের সঙ্গে তার প্রভেদ অনেক। সাহিত্যের মানুষগুলি রক্তমাংসের মানুষ হইয়াও যেন তাহাদের অতিক্রম করিয়া মানুষের একটা বিশেষ রূপেরই ইঙ্গিত করে। ভাস্কর পাথর কুঁদিয়াই মূর্ত্তি গড়ে বটে কিন্তু সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আর পাথরের কথা মনেও আসে না। সে তাহার নিজ হৃদয়ের রস-কল্পনা ঢালিয়া দেয় নীরস পাথরের উপর, পাথর গ্রহণ করে এক বিশেষ রূপ। কিন্তু সেই রূপও ঠিক সেই মূর্ত্তির সীমার মধ্যেই ধরা থাকে না—সে স্বতঃই মনকে অসীমের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। সাহিত্যেও ঠিক সেই রূপই ঘটে।

এক হিসাবে সকলেই সাহিত্যিক, সকলেই শিল্পী। জগতের নব নব রূপ দেখিয়া, ভরা পূর্ণিমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলের মনেই কিছু না কিছু ভাবের উদয় হইতে বাধ্য। বাহিরের কোন কিছুর প্রকাশে অন্তরের রস যখন উদ্দীপিত হয় তখনই এক বিচিত্র আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হয়। বাহিরের সেই প্রকাশকেই বলিতে পারি সাহিত্য, শিল্প।

কিন্তু রসানুভূতির শক্তি সকলের সমান নহে। যাহার মধ্যে ইহা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, বাহিরের জগতের বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য্য তাহাকে এত পূর্ণ করিয়া দেয় যে, তাহার কিছুটা প্রকাশ না করিয়া সে থাকিতে পারে না। তাই প্রকাশভঙ্গির উপরও সাহিত্যের রূপ নির্ভর করে অনেকখানি। যিনি জগতকে যত বেশী উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি তত বড় সাহিত্যিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন কারণ তাঁহার কল্পনায় ও প্রকাশেই অপরূপ রস সৃষ্ট হয়।

এই প্রকাশ করিতে বাগ্‌বিন্যাস বা অলঙ্কারই কি সব? সব নহে তবে কিছু নিশ্চয়ই। সালঙ্কারা সুন্দরী অলঙ্কারহীনা সুন্দরী অপেক্ষা অসুন্দর একথা কিছুতেই বলা চলে না। সেই অলঙ্কার সোনার হইবে কি ফুলের হইবে তাহা লইয়া তর্ক তোলা চলে কিন্তু নিরাভরণার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইলে ভারতীয় সুন্দরীরা মুখ ফিরাইয়া লইবেন সন্দেহ নাই। সুন্দরের অসীমত্ব আভরণের সীমার মধ্যে বিধৃত হইয়া প্রকাশ-ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। তাই যে কোন ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করিলেই সাহিত্যে চলে না। তত্ত্ব ও তথ্যের ভারে যাহা ভারাক্রান্ত তাহা কখনই সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে বক্তব্যটাই প্রধান, তাই যে কোন ভাষা ব্যবহার করিয়া বুঝাইবার পালা শেষ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিকের চলে। কিন্তু আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকেও আমরা বলি, চমৎকার, যেন সাহিত্য! কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক সত্য, কারণ রসসৃষ্টিতে ভাষা ও ভাবেরই সমন্বয়। তাই ভাষাকে তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই।

তথাপি এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে সাহিত্যে ভাবেরই প্রাধান্য। কাহাকে প্রকাশ করিতেছি? বাহিরের জগৎ আমার মনে যে ভাবের সঞ্চার করিয়াছে তাহাকেই ত' আমি প্রকাশ করিতে চাই। জগৎ ও 'আমি'র মিলনেই সৃষ্ট হইয়াছে এই ভাব। কিন্তু জগৎ ও 'আমি'র মিলনেই যদি সাহিত্য সৃষ্টি হইত তবে 'আমি'র বাহিরে যাহারা তাহাদের তাহা ভাল লাগিবে কেন? সেইটাই সাহিত্যের গূঢ় কথা।

বাহিরের জগৎকে অন্তরের রসে জারাইয়া আমার এই 'আমি'কে যখন সকলের করিয়া প্রকাশ করিতে পারি তখনই তাহা সার্থক, তখনই তাহা সাহিত্য—রস সৃষ্টি। ইহা সম্ভব হয় কখন? সম্ভব হয় তখনই যখন সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমি একাত্মতা অনুভব করি—আমার হৃদয় বৃত্তির রসে জারিত বিশ্ব তখনই সকলের হৃদয় স্পর্শ করিবে। এই স্পর্শ করিবার কাজ সম্পন্ন হইলেই সাহিত্য দেয় আনন্দ।

কুৎসিত যাহা তাহা মানুষকে ছোট করে। সুন্দরের পূজারী সে হইতে পারে না, তাহার 'আমি'র গণ্ডি ছোট হইয়া আসে, সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করিবার শক্তি তাহার থাকে না। মানুষের মনকে রসাপ্লুত করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দিতে পারে কেবলমাত্র সুন্দর যাহা তাহাই। বিশ্বকে এক এবং অখণ্ডরূপে যে দেখিতে পারে সেই সুন্দরের পূজারী। তাহার সৃষ্ট সাহিত্যই তাই সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের মানুষকে আনন্দ দিতে পারে।

কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের আসর জমাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন কয়জন? বিশেষ কোন স্থান বা কালের স্বল্লায়ু সাহিত্যিকের সংখ্যাই ত' বেশী। যে সাহিত্যিক স্থান কালের সীমা অতিক্রম করিতে অক্ষম হন তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য সর্ব্বদেশে বা সর্ব্বকালে সমাদৃত না হওয়াই সম্ভব। কারণ সেই সাহিত্য বিশেষ কোন দেশের বা কালের লোকের মনেই ভাব ও রসানুভূতি জাগায়। সেই বিশেষ দেশ বা কালের লোক তাহাকে বরণ করিয়া লইতে পারে কিন্তু সর্ব্বদেশে বা সর্ব্বকালে তাহা মানুষের হৃদয় বৃত্তিকে রসাপ্লুত করিবে কোন্ শক্তিতে? ভারতের সমস্যাকে যখন অন্যদেশের সমস্যা হইতে পৃথক করিয়া দেখি তখন ভারতীয় সমস্যার উপর রচিত সাহিত্য অন্য দেশের লোকের মনে আনন্দ জাগাইবে কিরূপে? তাই এই স্থান ও কালের সীমায় আবদ্ধ সাহিত্য কখনও বিশ্ব-সাহিত্য বলিয়া বিবেচিত হয় না।

সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা কি? সাহিত্য মানুষের মনকে সুন্দর করে এবং বিশ্বের সকলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করায়। সুন্দর

সাহিত্য ভারতের লোককেও যেমন আনন্দ দেয় ল্যাপ ল্যাণ্ডবাসী ও [illegible]ও ঠিক তেমনই আনন্দ দেয়। আনন্দ মনের ময়লা দূর করে। মানুষের চিরন্তন কথাকে মানুষের মনের মধ্যে দানা বাঁধাইয়া দেয়। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সুন্দরকে জানি, সুন্দরকে জানিয়া সুন্দর হই।

সাহিত্য শুধু সাহিত্যের জন্যই সৃষ্ট একথা একদল লোক বলিয়া থাকেন। কিন্তু সাহিত্যিক ত' শুধু বিলাসী ন'ন—তিনি পাগলও নহেন। তাঁহাকে আমরা বলি দ্রষ্টা। মানুষের অখণ্ডরূপ, বিশ্বের অখণ্ডরূপ, তাঁহার অন্তরের আনন্দলোকে ধরা পড়িয়া যায়। সে আপনাআপনি ধরা পড়ে, তর্কজালের ভিতর দিয়া তথ্য হিসাবে তাহার আনাগোনা হয়না সাহিত্যিকের অন্তরে। দ্রষ্টার ন্যায় উপলব্ধি করেন বলিয়াইত' তিনি স্রষ্টা। এই উপলব্ধির জগৎ ঠিক সেই তথাকথিত শিক্ষার জগৎ নহে। তাইত দেখি অতি শিক্ষিতও শিক্ষাভিমানে জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিচার করিতে গিয়া বিশ্বজনীন রস লোপ করিয়া দেন, আবার অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতও জগৎকে চিনিয়া এবং উপলব্ধি করিয়া নিজে রসস্রোতে ভাসিয়া অপরকেও ভাসাইয়া লন। এই আস্বাদ দিতে পারিলেই মানুষকে ছোট হইতে বড় হইবার পথে লইয়া যাইতে পারা সম্ভব—ইহাইত' পরম শিক্ষা! তাই সাহিত্যিকের কাজ শিক্ষা দেওয়া নিশ্চয়ই। তবে সে শিক্ষা দানের মধ্যে তর্কজাল বুনিবার চেষ্টা নাই—পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় বেত্র তুলিয়া তর্জ্জনও নাই। এ যেন শিশুর মাকে দেখিয়া মায়ের স্নেহ ভালবাসা উপলব্ধি করিয়া তাহারই ভিতর দিয়া বিশ্ব-মানবের সঙ্গে স্নেহ বন্ধন অনুভব করা।

রস পরিবেশন করিয়া আমাদের ও বিশ্বের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার ভার সাহিত্যিকদের, শিল্পিদের উপর। যে সূক্ষ্ম অদৃশ্য সোণার তার বিশ্বমানবকে একসূত্রে গাঁথিবার জন্য বিধাতার ইচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে ছড় টানিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে যেদিন একই সুরের ঝঙ্কার তাঁহারা তুলিতে পারিবেন সেইদিন তাঁহাদের দানকে পরমদান বলিয়াই মনে করা যাইবে এবং সেইদিনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপন্যাস

সর্ব্বদেশেই উপন্যাসের আদর। যে কোন দেশের যে কোন গ্রন্থাগারের হিসাব গ্রহণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সভ্যদের গৃহীত পুস্তকের শতকরা ৭০।৮০ ভাগই উপন্যাস। ইহার প্রধানতম কারণ এই যে মানুষ গল্প শুনিতে ভালবাসে। ঠাকুরমার কোলে শুইয়া সেই শৈশবেই রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প শুনিতে শুনিতে তাহার মন কোন্ অনির্দ্দিষ্ট লোকে চলিয়া যাইত। নিজেকে রাজপুত্র বলিয়া কতবারই না সে কল্পনা করিয়াছে! মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর অস্তিত্বে কোন দিন সে সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। সন্দেহ করিলে রহস্যলোক আর থাকিত কি—কল্পনার রাজকন্যা তাহার অজস্র রূপরাশি লইয়া মায়া-লোক সৃষ্টি করিত কি? শিশুমনে কৌতূহল আছে, প্রশ্ন নাই। রূপকথাই তাই তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

উপন্যাসে সেই গল্পকেই আমরা নূতন করিয়া পাই। কিন্তু আর ত' আমাদের সেই শিশুমন নাই। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর কথার ভিতর দিয়া রাজকন্যা উদ্ধারের উপায় সন্ধানে আর আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কৌতূহল কিছু কমিয়াছে, প্রশ্ন বাড়িয়াছে এবং তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। ঔপন্যাসিকের তাই গল্প বলিতে হইবে অথচ তাঁহার রূপকথা সৃষ্টি করিবার উপায় নাই। পাঠকের রক্ত মাংসের দেহের সহিত তাহার সম্পর্ক থাকা চাই। দৈনন্দিন জীবনে যাহা আমরা দেখিতেছি, যাহা আমরা দেখিতে চাই তাহাকেই পাইতে চাই উপন্যাসের মধ্যে। ঔপন্যাসিকের গল্প তাই হইবে মানুষের গল্প। মানুষের জীবনে যাহা ঘটিয়া থাকে—যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে তাহা লইয়াই সৃষ্ট হয় উপন্যাস। নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষের পূর্ণ চিত্রটি আঁকিয়া দিতে হইবে তাঁহাকে। এলেইন বলিয়াছেন, "প্রতিটী মানুষের মধ্যে দুইটী দিক আছে, একটী ইতিহাসের এবং অপরটী উপন্যাসের উপযোগী। মানুষের

যাহা বাহির হইতে জানা যায়—যেমন তাহার কার্য্য এবং তাহা হইতে বোধগম্য অন্যান্য বিষয়—তাহাই তাহার মধ্যকার ইতিহাসের দিক। কিন্তু তাহার অন্তরের ব্যথা, আনন্দ, ভাবনা-বাসনা প্রভৃতি যে সমস্ত রহস্যময় ভাবগুলিকে সে লজ্জা ও নম্রতার জন্য প্রকাশ করিতে পারে না সেগুলিকে উন্মুক্ত করিয়া দেখানই উপন্যাসের প্রধান কার্য্য"।)

রূপকথার মধ্যে শিশু তাহার কৌতুহল মিটাইবার সুযোগ পায়। যে পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহারই শেষ প্রান্তের দীঘীর তলায় বিরাট প্রাসাদে স্ফটিকের পালঙ্কে শুইয়া আছে যে অপরূপ রাজকন্যা তাহাকে সোনার কাঠির স্পর্শে সেই ত' জাগাইবে—কালো ভ্রমরার মৃত্যুও ত' তাহারই বক্ষে! তারপর রাজকন্যা হইবে তাহার টুকটুকে বউ, তাহার কোলে মাথা রাখিয়া সে কত গল্প শুনিবে সেই বুড়ী রাক্ষসীর। জৈব প্রবৃত্তি নাই—কৌতুহল নিবৃত্তির মধ্য দিয়াই তাহার আনন্দ। উপন্যাসের মধ্যেও আমাদের তাহাই কাম্য। (উপন্যাসে আমরা নিজেদের দেখি—দেখি সমাজের মানুষের পূর্ণরূপটী। বাস্তবে আমরা সম্পূর্ণ মানুষটীকে দেখিতে পাই না—তাহার অন্তরের সবকথা আমাদের নিকট কখনও স্পষ্ট হয় না। তাহার কার্য্যের ভিতর দিয়া তাহাকে যতটুকু আমরা বুঝিতে পারি তাহার কিছুমাত্র বেশী জানিবার উপায় আমাদের নাই। কিন্তু উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাহার মনের গোপন তলার কথা পর্য্যন্ত আমাদের বলিয়া দেন—উন্মুক্ত করিয়া দেখান তাহার বক্ষ।) (ফরস্টার বলিয়াছেন, "ঔপন্যাসিকের ইচ্ছা হইলে উপন্যাসের মানুষগুলিকে পাঠক সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে; তাহাদের অন্তর ও বাহির উন্মুক্ত করিয়া দেখান সম্ভব। এই কারণেই তাহারা ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির এবং আমাদের বন্ধুদের অপেক্ষাও অনেকাংশে স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" মানুষের পূর্ণরূপটী দেখিতে পাই বলিয়াই উপন্যাস আমাদের ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে পারি, "স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা কোন সমগ্রভাবে দেখিতে পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া।")

আমাদের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মুক্ত হইয়া যায় বলিয়াই উপন্যাস পাঠে আমাদের এত আসক্তি। তথাপি উপন্যাসের চরিত্রগুলি আমাদের নিজেদের রূপ হইয়াও যেন আমাদের অতিক্রম করিয়া আছে। আমাদের মনের প্রকাশ বলিয়াই তাহা আমাদের রূপ—আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমনিভাবে আমাদের প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়াই উহা আমাদের রূপ নহে। অন্তর্জগতে উপন্যাসের সহিত আমরা একাত্ম হইতে পারি কিন্তু বাস্তব জগতে তাহারই উপর রঙ বুলাই। উপন্যাসে নিজেদের এই যে প্রকাশ তাহা রূপকথা নহে—ইহার মধ্যে রহিয়াছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। কারণটায় আমরা পুরাপুরি খুশী না হইতে পারি, সে লেখক ও পাঠকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা—কিন্তু এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধই প্লটের মূল। মূলতঃ তাই গল্পে ও প্লটে রহিয়াছে একটা পার্থক্য। গল্প কেবলমাত্র একটার পর একটা ঘটনা বলিয়া যাওয়া; প্লটেও সেই ঘটনারই সন্নিবেশ তবে তাহাতে থাকিবে কারণ দর্শান—ঘটিল বটে কিন্তু কেন? গল্পে থাকে ঘটনা, তাহা কেবলমাত্র মনে রাখিলেই চলে—বুদ্ধি দিয়া এক্ষেত্রে বিচার করিবার কিছু নাই। কিন্তু প্লটে বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ত। কোন্ কার্য্যের কি ফল হইল তাহা বোঝা শিশু মনের কর্ম্ম নয়, আর ইহা বুঝিতে না পারিলে রসাইয়া উপন্যাস পাঠও অসম্ভব। ফরষ্টার বলিয়াছেন, "প্লট বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি দাবী করে। ......ঘটনাবিন্যাসকারী আশা করেন যে আমরা মনে রাখিব, এবং আমরা আশা করি যে তিনি কোন ফাঁক রাখিবেন না। প্লটে প্রতিটী কার্য্যের ও বাক্যের মূল্য থাকা চাই।" তাই রূপকথা শিশুদের আর উপন্যাস বুদ্ধিযুক্ত মনের।

ঘটনা বিন্যাস করিতে চাই কতকগুলি চরিত্র। চরিত্রগুলির সাহায্যেই ঔপন্যাসিক তাঁহার গল্প বলিবেন। সেগুলি অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত হইতে পারে কিন্তু জীবন্ত হওয়া চাই। পড়িতে পড়িতে তাহাদের ছবিও যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়াই তাহাকে ফুটাইয়া তোলা যায়। যেখানে যত ঘাত প্রতিঘাত সেখানেই তত সৌন্দর্য্য,

তাই জলাশয় অপেক্ষা নদী এবং নদী অপেক্ষা সমুদ্র এত মনোমুগ্ধকর। সর্ব্বত্রই সেই জল—অথচ কত না পার্থক্য! উপলব্ধির পক্ষে এই ঘাত প্রতিঘাত একান্তই প্রয়োজনীয়। (ফিল্ডিংএর মতে, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই কেবলমাত্র মানুষের পূর্ণ চিত্র আঁকিয়া দেওয়া যায়। ঔপন্যাসিক দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকটী চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন অথবা নিজে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করিয়া সৃষ্ট চরিত্রকে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু বর্ণনা এবং বিশ্লেষণই যদি উপন্যাসটীকে দখল করিয়া বসে তবে চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করিয়া তোলা কঠিন। চক্ষের সম্মুখে বিভিন্ন ব্যক্তির কথা ও কার্য্য যে চিত্র ফুটাইয়া তোলে তাহাই আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে সহজে। অনেকে প্লটকে প্রাধান্য দিয়া চরিত্রসৃষ্টিতে বিশেষ মন দেন না, গল্পটাই তাঁহাদের কাছে বড় হইয়া ওঠে, গল্পটী সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে যথাযথ রূপে প্রকাশ করিতে পারিল কিনা সেদিকে তাঁহারা দৃষ্টি দেন না, অনেকে আবার চরিত্রগুলিকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া গল্পকে দানা বাঁধাইয়া তুলিবার প্রয়োজন তেমন করিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে চরিত্র ও প্লট ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। চরিত্রসৃষ্টির জন্যই প্লট এবং প্লটের জন্যই চরিত্র। অতএব পরস্পরের সহায়তায় যেখানে পরস্পরের বৃদ্ধি সেখানেই সত্যকার উপন্যাস সৃষ্ট হইয়াছে বলা শোভন। অবাস্তব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তিনি প্লটকে বাঁচাইতে পারেন না, চরিত্রগুলিকে রক্ষা করিবার ভরসায় প্লটে অস্বাভাবিকতা আনিয়া ফেলিবার অধিকারও তাঁহার নাই। প্লট ও চরিত্রগুলিকে চলিতে হইবে হাতে হাত মিলাইয়া পরস্পরের পরিপূরকরূপে।)

(চরিত্রগুলির কার্য্যকলাপ, ভাবনা-চিন্তা, এবং কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়াই আমরা তাহাদের বুঝিয়া লইব। এই কথাবার্ত্তার দিকটাকে নাটকীয় ভঙ্গী বলা যাইতে পারে। এখানে ঔপন্যাসিক দূরে সরিয়া যান। অনেকে কথাবার্ত্তাকে প্রধান স্থান দেন না, কেহবা পত্রের ভিতর দিয়া, কেহবা আত্মকথারূপে উপন্যাসের গল্প বলেন। চরিত্র তাহার মধ্যে আছে ঠিকই—কিন্তু ঘাতপ্রতিঘাত ইহাতে বিশেষ দেখা যায় না।

অনেকে আত্মকথার মধ্যে কথাবার্তা দিয়া থাকেন। কিন্তু এই রূপায়ণের মূল অসুবিধা এই যে আত্মকথার মধ্যে যাহা থাকে তাহা যে পূর্ব্বেই ঘটিয়া গিয়াছে সে বোধ নিরন্তর পাঠকের মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। নূতন করিয়া আর ঘটিবার কিছু নাই—কিন্তু সাধারণ উপন্যাসে এই অসুবিধা দেখি না। মনের একটা অংশ যেমন এখানে পিছনে পড়িয়া থাকিয়া পঠিত বিষয়ের যোগসূত্র ধরিয়া থাকে অপর একটী অংশও সেইরূপ নূতন কি ঘটিবে জানিবার জন্য সম্মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিয়া থাকিয়া উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে আগাইয়া যায়। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা জানা অপেক্ষা, যাহা ঘটিবে এবং তাহারই সম্মুখে ঘটিবে তাহা জানিবার আকাঙ্খা মানুষকে অনেক অধিক আকর্ষণ করে।)

(কিন্তু এই কথা বলাইবার মধ্যেও সংযম থাকা প্রয়োজন। চরিত্রগুলি অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতেছে দেখিলে যেমন আমরা বিরক্ত হই—অনেক বড় বড় এবং কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিতেছে দেখিলেও সেইরূপ আমরা তাহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠি। অপ্রয়োজনীয় কোন কথাই আমরা তাহাদের নিকট শুনিতে চাই না। ঔপন্যাসিকের নিজের যদি কিছু কক্তব্য থাকে তাহাও খুসীমত কোন চরিত্রের মুখে বসাইয়া দিবার অধিকার তাঁহার নাই। চরিত্রের স্বাভাবিকতা বজায় রাখিয়া যতদূর সম্ভব তিনি তাঁহার কথা বলিতে পারেন—কিন্তু তাঁহাকে সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, পাঠকের মনে যেন মুহূর্ত্তের জন্যও একথা উদিত না হয় যে চরিত্রের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার কথা বলিতেছেন। তাহাতে চরিত্র সৃষ্টিও সুন্দর হইবে না—উপন্যাসেরও রসহানি হইবে।)

সাহিত্যিকের কল্পনা আকাশ কুসুম নহে। পৃথিবীর মাটীতে যাহা কোনদিন রস গ্রহণ করে নাই অথবা সেই রসের স্পর্শ যাহা কোনদিন পায় নাই তাহা কাহারও কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। সাহিত্য সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই সত্য। জগতের বিভিন্ন আদর্শ ও চিন্তাধারা হইতে সাহিত্যিক তাঁহার রসদ সংগ্রহ করেন এবং তাহারই

সহিত নিজের জীবন-দর্শন মিলিত করিয়া তিনি সৃষ্টি করেন। তাঁহার জীবন-দর্শনে অস্বাভাবিকতা থাকিতে পারে, মূল বিষয়ের উপর তিনি অত্যধিক কল্পনার রঙ ছড়াইতে পারেন কিন্তু মূল কথায় তিনি মাটীর সম্পর্কশূন্য হইতে পারেন না।

জগৎ ও মানুষ, মানুষ ও সমাজ এবং মানুষ ও মানুষে যে সম্বন্ধ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে বার বার ঘা মারিয়া যায় তাহা হইতেই তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত দর্শন গড়িয়া তোলেন। বিশ্বের বিপুল ভাণ্ডার হইতে যাহা খুসী তিনি গ্রহণ করিতে পারেন এবং যাহা খুসী বাতিল করিয়া দিতে পারেন। সমস্ত খণ্ড চিত্র মিলাইয়া তাঁহাকে এক অখণ্ড চিত্র মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং নিজস্ব জীবনদর্শনের আদর্শে যাহাকে তিনি সত্য বলিয়া মনে করেন তাহাকেই রূপদান করিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভাব ও ভাষার সাহায্যে তিনি নিজের জীবনদর্শন রূপায়িত করিবেন সত্য কিন্তু সেই রূপায়ণের কার্য্যে তিনি নিজে থাকিয়া যাইবেন সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি তাঁহার নিজের কথা না দিয়া পারেন না কিন্তু সেই কথাগুলির প্রকাশ হওয়া চাই আপনা আপনি--ঔপন্যাসিক যে কোন উপায়ে সেগুলিকে প্রকাশ করিতে পারেন না। শুধু মতবাদ প্রকাশের মধ্যে উপন্যাসের সীমা নির্দ্ধারিত নহে—তাহার জন্য রহিয়াছে প্রবন্ধ সাহিত্য। উপন্যাসে চাই পৃথিবীর বস্তু, লেখকের জীবনদর্শন এবং উহাদের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উপন্যাস সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়। উহার চরিত্রগুলি ঔপন্যাসিকের কথার বাহন মাত্র নহে, তাহারা জীবন্ত, প্রাণবন্ত—আমাদের চক্ষের সম্মুখে তাহারা রূপ লইয়া কাজ করিয়া যায়। অনেক তথাকথিত বাস্তববাদী মনে করেন উপন্যাস মতবাদে ভারাক্রান্ত হইলে কোন দোষ নাই, এমন কি অনেক সময় তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে এইরূপ মতবাদে ভারাক্রান্ত না হইয়া আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশ ভীরুতারই লক্ষণ মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অন্যতম প্রধান বাস্তববাদী মনীষী এঞ্জেলস্ বলিয়াছেন যে, লেখকের মত যতই গোপন থাকিবে শিল্প ততই সুন্দর

হইবে। তিনি আরও মনে করিতেন যে লেখকের নিজস্ব কথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং ঘটনাদির সাহায্যেই প্রকাশিত হইবে—তাহার জন্য কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন, সৃষ্ট শিল্পের সহিত লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল (Conform) থাকা চাই কারণ তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীই শিল্পগত ঐক্য দান করিতে পারে। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিগত মত যেন কোথাও বাধা সৃষ্টি না করে। তাঁহার মতবাদ প্রচার করিলেও চলিবে না—ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রগুলির ভিতর দিয়াই তাহাকে আপনা হইতেই প্রকাশিত হইতে হইবে।

ঔপন্যাসিককে উপন্যাসের মধ্যে আমরা পাইয়াও পাইব না। বিশ্বস্রষ্টা যেমন প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াও ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া যান, আভাসে-ইঙ্গিতেই তাঁহাকে বুঝিয়া লইতে হয়—ঔপন্যাসিককেও আমাদের ঠিক সেই রূপেই জানিতে হইবে। চরিত্রগুলির ভাবনা-কল্পনা বিশ্লেষণেই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব কিন্তু তাহাদের কার্য্য ও কথাবার্ত্তায় তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন। ফ্লাউবের্ট বলেন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরের মতই লেখক তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্ব সময়ে উপস্থিত থাকিয়াও কোথাও প্রকাশিত হইবেন না।"

মানব-জীবনের কঠোর সমস্যা বিশ্লেষণকেই বঙ্কিমবাবু উপন্যাস বলিতেন। ঈশ্বর যেমন সৃষ্টির মধ্যে মানুষের রূপ আঁকিয়াছেন ঔপন্যাসিকও সেইরূপ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে রূপায়িত করেন। নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সৃষ্ট চরিত্রের সাহায্যে তিনি মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করেন। সমাজ, প্রকৃতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামরত মানুষের রূপটী প্রকাশ করাই তাই উপন্যাসের মূল কথা। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এই কথাটাই সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "সাংসারিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্যহৃদয়ে অহরহ একটা আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব চলিতেছে; এই দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম আলোচনা ও

উহার সংঘাতের মধ্য দিয়া মানবজীবনের একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করা—ইহাকেই উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলা যাইতে পারে।" (শনিবারের চিঠি; চৈত্র ১৩৫৫)

ঐতিহাসিক উপন্যাস—

বিশ্বের বিপুল ভাণ্ডার হইতে যাহা খুশী গ্রহণ ও বর্জন করিবার অধিকার আছে ঔপন্যাসিকের। বর্ত্তমানকে ছাড়িয়া অতীত দিনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার ইচ্ছাও তাঁহার হইতে পারে— বাস্তবতা ও নানা সমস্যার ঢাক-ঢোল পিটাইয়াও তাঁহাকে বাধা দিবার কোন উপায় নাই। বিগত দিনের কোন ঘটনা বা কোন চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হইলেই সাধারণতঃ আমরা তাহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে পারি।

'সাধারণতঃ' কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি, কেননা ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে গ্রহণ করিয়া আর কোথাও যদি তিনি ইতিহাসকে না মানেন তবে সেই উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া পরিচিত হইবার অধিকার জন্মে না। অপরদিকে, অতীতের কোন ঘটনা অবলম্বন করিয়া অথবা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তিনি নরনারীর চিরন্তন সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রীতির কথা বলেন তাহা হইলেও তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য হয় না। অতীতের নরনারীকে অবলম্বন করিয়া মানুষের মনের ভাবনা-বাসনার চিত্র আঁকিতে হইলে সেই সময়ের সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ত' তাহা করিতে হইবে—অন্যথায় কালবিরোধ দোষ ঘটিয়া উপন্যাসের সৌন্দর্য্যহানি করিয়া বসিবে। বর্ত্তমান মানুষের প্রেম-প্রীতি, বিরহ-মিলন লইয়া যে উপন্যাস রচিত হয় তাহার পারিপার্শ্বিকরূপে আমরা বর্ত্তমান সমাজকেই ত' পাই। এইরূপ একটী উপন্যাসের রচনার তারিখ মুছিয়া দুইশত বৎসর পরের মানুষের হাতে দিলে কি তাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস হইয়া পড়িবে? তাহা যদি হয় তবে আজ যাহা সামাজিক উপন্যাস তাহাই একশত বৎসর পরে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া গণ্য হইবে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রের পল্লী সমাজের কথাই ধরা যাউক। বর্ত্তমান পল্লী সমাজের একটী চিত্র ইহাতে নিখুঁতভাবে আঁকা হইয়াছে। এইবার দুইশত বৎসর পরের কথা কল্পনা করা যাউক। শরৎচন্দ্রের পল্লী সমাজের রচনার তারিখ মুছিয়া এই দুইশত বৎসর পরের তারিখ বসাইয়া তাহা যদি তখনকার দিনের কোন ঔপন্যাসিকের নামে প্রকাশ করা যায় তবে কি ঐতিহাসিক উপন্যাস হইয়া যাইবে ।

পুরানো দিনের সমাজচিত্র থাকিলেই উপন্যাস ঐতিহাসিক হইয়া যায় না। কোন ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করিয়া সমসাময়িক সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার, ঘটনাবলী প্রভৃতি বজায় রাখিয়া যে উপন্যাস রচিত হয় তাহাকেই খাঁটী ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা চলে। ঐতিহাসিক চরিত্র স্থলে যদি কোন বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া উপন্যাস রচিত হয় এবং যদি সেই ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া উপন্যাসের নরনারীরা পাক খাইয়া চলিতে থাকে এবং উপন্যাস পাঠান্তে যদি সেই ঘটনার বেশই প্রধান হইয়া উঠিয়া আমাদের জড়াইয়া ধরে তবে তাহাকেও ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিব। কেবলমাত্র ইতিহাস থাকিলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় না।

ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি, 'নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া মানুষের পূর্ণ চিত্রটী আঁকিয়া দিতে হইবে তাঁহাকে'। ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়— পুস্তক ও প্রচলিত কাহিনীর উপরই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়। কালবিরোধ দোষ হইতে তাঁহাকে মুক্ত থাকিতে হইবে। বিগত দিনকে ধরিয়া দিতে হইলে সেই সময়কার আচার-ব্যবহার, সংস্কার, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। স্কট এই সব বিধি নিষেধ মানিয়া চলেন নাই বলিয়া বর্ত্তমানের দৃষ্টিতে তাঁহাকে খাঁটী ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক বলা চলে না।

কিন্তু সমস্ত বিধি নিষেধ মানিয়া চলা বোধ হয় সম্ভব নয় কারণ

ইতিহাস ও কল্পনা মিশিয়াই ত' ঐতিহাসিক উপন্যাস। কেবলমাত্র ইতিহাস লইয়া উপন্যাস হয় না আবার কল্পনার পাখা মেলিয়া দিয়াও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নয়। ইতিহাসকে বিকৃত করিবার অধিকার ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের নাই—এক বিশেষ গণ্ডীতে তাঁহার হাত পা বাঁধা। যেখানে যেখানে এই টানা গণ্ডীর বাঁধন আল্‌গা সেখানে সেখানেই কেবলমাত্র তিনি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু এই কল্পনাও হইবে মূল ইতিহাসের পরিপূরক।

'ইতিহাস' ও 'ইতিহাসের পরিপূরক' কথা দুইটা যত সহজে বলা গেল তত সহজে বলিবার মত নহে। ইতিহাস যত তথ্যের উপরই নির্ভর করুক না কেন দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন মিলিত হইলে জল হয় বলিলে যে বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে আমাদের বোধ জন্মে তাহার মত সত্য হইয়া উঠে না। সুতরাং ইতিহাস বলিয়া যাহাকে অবলম্বন করিয়াছি তাহা যে সত্যই ইতিহাস তাহার প্রমাণ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, "কেমন করিয়া বুঝিবে অদ্য যে ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব, কল্য নূতনাবিষ্কৃত দলিলের জোরে তাহাকে ঐতিহাসিক সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না? অদ্যকার প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবেন, কল্যকার নূতন ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে নিন্দা করিলে কি বলিব?" ইতিহাসবেত্তারা তাই বলেন, ইতিহাস অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লেখা ছাড়িয়া দাও, অযথা মানুষের মনে ভ্রান্তি উৎপাদন কেন করিবে? আমরা ইতিহাসবেত্তা নহি, ইতিহাসকে কুর্নিশ করিয়া বলিব, তোমার জ্ঞানটুকু লইয়াই ত' আমার কারবার নহে, তাহা যদি হইত তবে উপন্যাস না লিখিয়া ইতিহাস লিখিতাম। ঐতিহাসিক চরিত্রটীর মধ্যে অথবা ইতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনায় আবর্ত্তিত মানুষগুলির বাসনা-কামনার মধ্যে চিরন্তনের যে সমগ্রীটি পাইয়াছি তাহাই রূপায়িত করিবার আকাঙ্খাতেই ত' উপন্যাস রচনা! ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য ইতিহাসের প্রচার নহে, আনন্দ দান। সেই আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যেই তিনি

ইতিহাসকে অবলম্বন করেন। ইতিহাস যদি সরিয়াও যায় দুঃখ নাই, আনন্দটুকু বজায় থাকিলেই হইল—আনন্দ যেদিন যাইবে সেদিন ইতিহাস লইয়া মাথা কুটিয়া কি ফল হইবে? আর ভ্রান্তি? ইতিহাসই কি অভ্রান্ত! এই মাত্র যাহা ঘটিল এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা নানা মিথ্যায় পল্লবিত হইয়া একদিকে এক এক রূপ লইয়া প্রচারিত হইবে। হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার যে কথাকে ইতিহাসবেত্তারা মানুষের স্কন্ধে চাপাইয়া দিতেছেন তাহাতে সকলের পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন কিসের জোরে সেই জন্যই কোন এক সমালোচক রহস্য করিয়া বলিয়াছেন, 'তারিখ ও নাম ব্যতীত ইতিহাসে সবই মিথ্যা এবং উপন্যাসে ওই দুইটী ব্যতীত আর সবই সত্য'। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিচার করিতে বসিয়া বর্ত্তমানে স্বীকৃত ইতিহাসের সহিত তাহার মিলটুকুই আমরা যাচাই করিয়া দেখিতে পারি—উপন্যাস হিসাবে তাহাকে খারিজ করিতে পারি না। আনন্দদান করিতে পারিলেই উহা সার্থক।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কক্ষপথ বড় সঙ্কীর্ণ—খাওয়া, পরা, শোওয়ার বাহিরে কতটুকু আমরা দেখি, কতটুকুই বা পাই! ঔপন্যাসিক এই সামান্যকে লইয়া সব সময়ে খুসী থাকিতে পারেন না। সুমেরু, কুমেরু ও গৌরীশৃঙ্গ আক্রমণের রোমাঞ্চকর ঘটনা হইতে, রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে তিনি তাই নূতন রসদ সংগ্রহ করিতে ব্যগ্র। উপন্যাসকে বিস্তৃতি দানই এই রসদ সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই রসদ সংগ্রহ করিতে গিয়াই তিনি এক বিশেষ গণ্ডীতে ধরা পড়িয়া যান। ইতিহাসের অনুরোধে না হইলেও রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি লোক প্রচলিত কাহিনী ও ইতিহাসকে মানিতে বাধ্য হন। শ্রীচৈতন্য কামান দাগিয়া যুদ্ধ করিতেন, রামচন্দ্র চরিত্রহীন, লম্পট ছিলেন একথা যে উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে তাহার দুর্ভাগ্যের কথা কল্পনা করা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব? কেন তাহার দুর্ভাগ্য? যে কাহিনী ও ঘটনা মানুষের চিত্তে এক বাসনার জগত সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে তাহার বিকৃতির ফলে রসহানি ঘটে এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উলটা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।" সুতরাং উপন্যাসকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেও ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের যতদূর সম্ভব প্রচলিত ইতিহাসকে বজায় রাখিয়া চলিতেই হয়।

রোমাণ্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্

অনেকে মনে করেন রোমাণ্টিসিজম্ ও ক্ল্যাসিসিজম্ পরস্পর-বিরোধী। অর্থাৎ রোমাণ্টিক বলিতে যাহা বুঝি ক্ল্যাসিক বলিতে ঠিক তাহার বিপরীত কথা মনে আসে। কিন্তু প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যেমন বিপরীত বিষয় এই দুইটী সেরূপ নহে। এই দুইটীর মধ্যে কিছুটা লক্ষণগত বিরোধ থাকিলেও উহাদের পরস্পরের পরিপূরক বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। বাস্তববাদকেই (Realism) বরং রোমাণ্টিসিজমের বিপরীত বলা যাইতে পারে, কারণ বাস্তববাদে বস্তুই সব এবং বস্তুতেই বস্তুর শেষ আর রোমাণ্টিক কল্পনায় বস্তু আরম্ভ মাত্র এবং অনেক সময় উহা তাহার সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে।

ক্ল্যাস বলিতে বুঝি শ্রেণী। যাহা প্রথম শ্রেণীর তাহাই ক্ল্যাসিক। প্রথম শ্রেণীর বলিলেই এক গম্ভীর অথচ পরম সুন্দর মূর্ত্তি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে। ইহা যেন পাথরে খোদা হারকিউলিসের মূর্ত্তি—খড়্গ নাসা, টানা টানা চোখ, সমুন্নত দেহ। ইহার সমস্তটাই স্পষ্ট, কোথাও আলো-আঁধারের রহস্যময়তা নাই। ইহার বিরাটত্ব আমাদের অন্তরকেও বিরাট করিয়া তোলে। তাই সহজ কথায় বলা চলে যে ক্ল্যাসিসিজম আমরা পাই প্রশান্তি, যথাযোগ্যতা, সংযম এবং আত্মস্থতা। সুন্দর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে গেলেই যথাযোগ্যতা, সংযম প্রভৃতি রক্ষা করিয়া চলা সাহিত্যিকের একান্ত কর্ত্তব্য। রোমাণ্টিক সাহিত্যও যথাযোগ্যতা ও সংযমকে একেবারে আতসবাজীর মত আকাশে ছাড়িয়া দিতে পারে না। যথাযোগ্য না হইলে তাহা সুন্দর হইতে পারিত না এবং সংযম না থাকিলে নিশ্চয়ই পাগলামিতে পরিণত হইয়া যাইত। সুতরাং যথাযোগ্যতা, সংযম প্রভৃতি কেবলমাত্র ক্ল্যাসিকেরই লক্ষণ একথা বলা চলে না। ক্ল্যাসিকে বুদ্ধির দীপ্তি, সূক্ষ্মতা, পবিত্রতা প্রভৃতি থাকিবেই এবং সেই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া যে রূপটী প্রকাশিত হইবে তাহা আমাদের উন্নততর স্তরে লইয়া যাইবে। জগতের ধূলাবালি হইতে অনেকটা উচ্চস্তরে উন্নীত করাই ক্ল্যাসিকের কার্য্য। যাহা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধির অধিগম্য ক্ল্যাসিক-লেখকগণ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেন। সহজ জ্ঞান ও বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁহারা সত্যে উপনীত হন। দেবতারাও তাঁহাদের পাশে সহজ মানুষের মতই আসিয়া দাঁড়ান। অতিচারী কল্পনার সাক্ষাৎ সেখানে মেলে না—বিষয়ের মধ্যে উত্তেজনার

সৃষ্টি না করিয়া বলিবার ভঙ্গীর দ্বারাই তাঁহারা বিষয়কে সুন্দর এবং মনোজ্ঞ করিয়া তোলেন। ওয়াল্টার পেটার বলেন, "যে চিরপরিচিত কাহিনী বার বার শুনিয়াও আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করে না তাহাকেই মনোজ্ঞ করিয়া বলা হয় বলিয়াই ক্ল্যাসিক সাহিত্য আমাদের এত আকর্ষণ করে।"

ম্যাকনিল ডিক্সন বলেন, "পতনোন্মুখ রোমক সাম্রাজ্য যখন উত্তরের অসভ্যদের দ্বারা প্লাবিত এবং বিজিত হয় তখন এই বিজয়ী উত্তরবাসীরা সেদেশীয় ভাষাকে গ্রহণ করিয়া রোমরাজ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। কিন্তু শিক্ষিতদের এই ভাষা ছাড়াও অসভ্যদের ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া সাধারণের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি ভাষারও উদ্ভব হয়। এইরূপে নানা মিশ্রণের ফলে ল্যাটিন ভাষা হইতে অনেকগুলি 'রোমান্স' ভাষা জন্মে।"

এই মিশ্রিত ভাষায় অদ্ভুতের বিস্ময় ছিল, কল্পনার অবকাশও ছিল। নানা মিশ্রণের ফলে সৃষ্ট বিচিত্র ভাষাগুলিতে এক রহস্যময় সৌন্দর্য্যও ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে সময়কার মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার শক্তিও যে সে ভাষায় যথেষ্ট ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এই নবসৃষ্ট ভাষাগুলিতে যে রহস্যময়তা অদ্ভুতত্ব এবং আকর্ষণী শক্তি ছিল সেইগুলিই ধীরে ধীরে সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করিয়া যে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যের সৃষ্টি করে তাহাকেই রোমাণ্টিক সাহিত্য বলে।

রোমাণ্টিসিজমের মধ্যেও রহিয়াছে সেই রহস্যময়তা, বিস্ময়—অতিচারী কল্পনা। যাহা দেখিতেছি তাহাই সব নহে, বৃক্ষের শাখা দুলিতেছে বলিলেই এখানে সব বলা হইল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের হৃদয স্পন্দনও অনুভব করিতে হইবে, সমস্ত প্রকৃতির পশ্চাতে এক ভাবুক চিত্তের স্পর্শ অনুভব করিতে হইবে—এই কল্পনা, এই রহস্যময়তাই রোমাণ্টিসিজমের মূল কথা। ওয়াল্টার পেটার তাই বলেন যে সৌন্দর্য্যের সহিত অদ্ভুতের মিলনই রোমাণ্টিসিজমের মূল লক্ষণ। আবার যেহেতু সমস্ত সাহিত্যের উদ্দেশ্যই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সেই হেতু বিস্ময়, অদ্ভুতত্ব ও কৌতুহলকেই তিনি রোমাণ্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু এই কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে অদ্ভুত হইলেই তাহা রোমাণ্টিক হইয়া পড়ে না। যাহা অসম্ভব তাহাও অদ্ভুত। যাহা অসম্ভব তাহা হাস্যরসের উপাদান হইতে পারে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেও এই অসম্ভবকে টানিয়া আনিতে পারি কিন্তু রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনার সহিত তাহাকে জুড়িয়া দিতে পারি না। এ্যাবারক্রম্বি তাই মনে করেন যে অজানার সম্ভাব্যতা কল্পনাই মাত্র উপলব্ধি করিতে পারে। রূপকথা যে অনুপাতে আমাদের অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত করে সেই

অনুপাতেই তাহা রোমান্টিক। বৃক্ষ শাখায় কম্পন দেখিয়া তাহার হৃদ্‌স্পন্দনের কথা কল্পনা করা যে খুবই স্বাভাবিক! মানুষের ক্ষেত্রেও য় আমরা ইহাই দেখিয়াছি। তাই এই কল্পনাকে বলি রোমান্টিক। রোমান্টিসিজমে যে অদ্ভুতত্ব, যে কৌতূহল আছে তাহা আমাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অফিস-কাছারী ও হাট-বাজারের মধ্যে কল্পনার অবকাশ নাই বলিলেও চলে। কিন্তু প্রতিদিনকার বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যেও এমন দুই-চারিটা দিন আসেই যাহা গৌরবোজ্জ্বল। কোন ছুটীর অবকাশে মনও হয়ত হাট-বাজার হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়—সন্ধ্যার অন্ধকারে গঙ্গার তীরে গিয়া কাহাকে যেন অনুভব করিয়া ফিরি। অথবা গভীর রাত্রে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া রাত্রি ও পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের হারাইয়া বসি। এই যে হারাইয়া বসা ইহা দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে আবার ইহা শুধুমাত্র কল্পনাই নয়—জীবনের অভিজ্ঞতায় ইহাকে আমরা বহুবার পাইয়াছি। (আমাদের ইন্দ্রিয় যেমন সত্য, আমাদের অনুভূতির জগতও তেমনি সত্য। এই অনুভূতির জগত হইতেই রোমান্সের সৃষ্টি। এ্যাবারক্রম্বিও তাই বলিয়াছেন, "রোমান্স আমাদের বস্তু হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। আমাদের মন বহির্জগত হইতে সম্পর্ক যেন ক্রমেই সরাইয়া লইয়া অন্তরে যাহা পায় তাহারই উপর অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে।" কিন্তু ইহাও যে সব কথা নহে তাহাও তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—"অনুভূতির উপর কেবলমাত্র রোমান্টিসিজমেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। দূরের অনুভূতি দেখা জিনিষের উপর কল্পনার রং মাত্র—কিন্তু তাই বলিয়া তাহা স্বতঃই রোমান্টিক মনে করিলে ভুল হইবে। বহির্জগতের বিনিময়ে অন্তর্জগতকে বড় করা হইলেই ইহাকে রোমান্টিক করিয়া তোলা হয়।"

কম্পটন-রিকেট বলেন যে বিস্ময়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিই রোমান্সের প্রথম লক্ষণ। অজানার প্রতি আমাদের মনে এক ভয়-বিস্ময় মিশ্রিত ভাব জাগেই। যাহা জানি তাহার প্রতিও যখন কল্পনার দৃষ্টি মেলিয়া চাই তখন সেই জানা বস্তুর মধ্যেও অনেক অজানার আভাষ পাইয়া আমরা বিস্মিত হই। তাই রোমান্সের স্পর্শে দর্শনও রহস্যময় ও আদর্শবাদী হইয়া উঠে। শঙ্করের মায়াবাদ, কান্টের তুরীয়বাদের (ট্রান্সেণ্ডেণ্টালিজম্‌) মধ্যেও সেই রোমান্সেরই হাতের ছাপ দেখি। ইতিহাসের ঘটনাবলী স্পষ্ট নহে, সেখানে অজানার ইঙ্গিত আছে বলিয়াই রোমান্টিক উপন্যাসে উহার এক বিশেষ স্থান আছে।

তাঁহার মতে দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে অনুসন্ধিৎসা। অনুসন্ধিৎসা বা জিজ্ঞাসার মূলে রহিয়াছে কৌতূহল। কৌতূহল মানুষের বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে। সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গভঙ্গ, জলপ্রপাত, ঝড়-ঝঞ্ঝা আমাদের কৌতূহলী করিয়া তোলে এবং বুদ্ধিকে জাগ্রত করে। জানিবার আগ্রহে আমরা বস্তুকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া যাই। শক্তির প্রকাশের পশ্চাতে তাই কোন শক্তিধরের কল্পনা খুবই স্বাভাবিক।

সহজবোধ দ্বারা জীবনের মৌলিক সারল্যের অনুভূতিকে তিনি তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কৃত্রিমতা দিয়া সব কিছুই আমরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই জীবনকে আজ আমরা চিনিতে পারি না। মানুষ হিসাবেই মানুষের মূল্য বুঝিতে হইবে। কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতা আমাদের মানুষ হিসাবে মূল্য দেয় না—রুশো সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করিয়া দীনতম মানুষেরও গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। রোমাণ্টিসিজ্‌ম্ এইরূপে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণের সন্ধান করে।

সাহিত্য মাত্রেরই কারবার আমাদের হৃদয়ের সহিত। ক্লাসিক সাহিত্য মহান চরিত্র বা বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমাদের অন্তরকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যায়। ভাবাবেগের কোন চিহ্ন এখানে নাই—ক্লাসিকের সংযম ও স্পষ্ট টানা চিত্র আমাদের হৃদয়কে সংযত করে, সমস্ত ইন্দ্রিয় ইহার সম্মুখে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু রোমাণ্টিসিজ্‌ম্ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ভালবাসিয়া কেবলই আকর্ষণ করে।

রোমান্স কথাটার উৎপত্তি যে সময়েই হউক না কেন, রোমাণ্টিক লক্ষণের প্রকাশও বিশেষ করিয়া যে সময়েই হইয়া থাকুক রোমাণ্টিক ভাবকল্পনার স্পর্শ আমরা সেই আদিকালেও পাইয়াছি। বেদের গানগুলির মধ্যেও রোমাণ্টিকতা আছে দেখা যায়, অডিসির মধ্যেও তাহার স্পষ্ট ছাপ আছে। ক্ল্যাসিকের মধ্যেও রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনা স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আহার না করিলে যেমন মানুষ বাঁচে না কল্পনা না করিয়াও সে তেমনি পারে না। সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রের আসা যাওয়া, প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তন দেখিয়া কোন এক অজানা শক্তির কল্পনা সে না করিবে কেন? এই কল্পনা সময়ে অসময়ে তাহাকে বাস্তব হইতে যদি দূরেও সরাইয়া লইয়া যায় তাহাতেও বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সেই কারণেই ক্ল্যাসিকের মধ্যেও আমরা রোমান্সের চিহ্ন দেখিয়া থাকি। তাই অ্যাবারক্রম্বি যখন বলেন যে, 'রোমাণ্টিসিজ্‌ম্ শিল্পের এক বিশেষ লক্ষণ কিন্তু

ক্ল্যাসিসিজ্ম্ বিভিন্ন শিল্প-লক্ষণকে মিলিত করিবার এক বিশেষ পদ্ধতি মাত্র'—তখন আমাদের তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়। 'ক্ল্যাসিসিজ্ম্ শিল্পের স্বাস্থ্য স্বরূপ। উহা কোন বিশিষ্ট লক্ষণ নহে, শিল্পের অনেক লক্ষণই পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া মিলিতে পারে, উহাদের সুষ্ঠু মিলকেই ক্ল্যাসিক বলা হয়।' এই লক্ষণগুলি পরস্পর বিরোধী হইতে পারে কিন্তু মিলনের ফলে যে রূপ দেখিব তাহাতে এই বিরোধের চিহ্নমাত্র থাকিলে চলিবে না। মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য তরল রক্তেরও যেমন প্রয়োজন কঠিন অস্থিরও সেইরূপই প্রয়োজন, কিন্তু কোনটারই মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে চলে না। যথাযথ স্থানে অস্থির সন্নিবেশ হওয়া চাই আবার রক্তের চাপও যেন অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়। ক্লাসিকেও ঠিক তাহাই দেখি—এখানে রোমাণ্টিক, বাস্তববাদ প্রভৃতি লক্ষণগুলির যথাযথ সমাবেশ চাই। কোন একটী লক্ষণ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিলে আর তাহাকে ক্ল্যাসিক বলিতে পারিব না। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন মানুষ খুবই কম দেখা যায়- ক্ল্যাসিক সাহিত্যও তাই বড় বেশী পাওয়া যায় না।

সুতরাং রোমাণ্টিসিজম্‌কে কোন এক বিশেষ কালের বলা চলে না। ক্ল্যাসিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলস্বরূপ রোমাণ্টিক ভাবকল্পনাকে পাইয়াছি বলা তাই যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাকে এক বিশেষ মানস দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। অল্প বিস্তর সেই আদি যুগ হইতেই এই দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের চোখে পড়িয়াছে।

রোমাণ্টিসিজমের মধ্যে বস্তুকে অতিক্রম করিবার যে প্রয়াস আছে তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে ইহা বাস্তববাদের বিরোধী। রোমাণ্টিক ভাবের সমর্থকরা একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা সত্যে উপনীত হইতে পারি না, রাত্রির অন্ধকারে হলুদ রংকে আমরা সাদা দেখি—সূর্য্যরশ্মিতে সাত রং এর মিশ্রণ হইলেও আমরা কি দেখিয়া থাকি? জগতের সমস্ত বস্তু ইলেক্‌ট্রোন-প্রোটোনের সমষ্টি হইলেও আমরা তাহা ইন্দ্রিয় দ্বারে বুঝিতে পারি কি? সুতরাং চক্ষু দিয়া যাহা দেখি তাহাই সব নয়—বস্তুর পশ্চাতে তাহার সত্যরূপ লুকাইয়া থাকা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। রোমাণ্টিক ভাবের সমর্থকরাও তাই বলেন, মানুষের যে-রূপ তোমারা দেখিয়াছ তাহাই তাহার সত্যরূপ নয়—আমার কল্পনাতেই তাহার প্রকৃতরূপ ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতির পশ্চাতে যে অতি-

প্রাকৃতের হাতছানি তাহা চর্ম্মচক্ষে ধরা পড়িবে না, অথচ তাহা খাঁটি সত্য। অনুভূতির জগতেই এই সত্য আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং রোমাণ্টিক লেখক অলীক জগতেই বিচরণ করেন না, তিনিই সত্যকে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন।

রোমাণ্টিক শিল্পীরা দৃশ্যমান জগতকে সাহিত্যের বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, ইহাকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন এবং তাহাকেই সত্য বলিয়া মনে করেন। বাস্তব জগতের সহিত তাঁহাদের মনের আদর্শ আকাজ্ক্ষা ও অনুভূতির মিশ্রনেই এই নূতম জগত সৃষ্ট। (ভাবের জগতের প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনে এবং অফুরন্ত বৈচিত্র্যে রোমাণ্টিক ভাব-কল্পনা উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। অপরদিকে, ভাবকে পরাজিত করিয়া যুক্তির প্রতিষ্ঠায় ক্ল্যাসিসিজম্ শান্তি পায়।

বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ

এ্যারিষ্টটল্ বলিয়াছেন, "শিল্প প্রকৃতির অনুকৃতি।" অবশ্য প্রকৃতি বলিতে তিনি জড় বস্তুর কথা মনে করেন নাই। শিল্প তবে কি অনুকরণ করিবে? প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তিকে শিল্প অনুকরণ করিবে। প্রকৃতি সৃষ্টি করে—শিল্পও সৃষ্টি করিবে। জড় বস্তু যেমন আছে তেমনি সাহিত্যে ধরিয়া দেওয়া ক্যামেরায় ছবি তোলার মতই—তাহা সৃষ্টি নয়, সুতরাং সাহিত্যও নয়। "বস্তুর যেমনটি হওয়া উচিত তাহাই শিল্পীর অনুকরণের বিষয়।" এই ঔচিত্য বোধেই সাহিত্যিক জড়বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যান। তাই গেটের কথা স্মরণ করিতে পারি, "শিল্প প্রকৃতি নহে বলিয়াই শিল্প।" গেটে প্রকৃতি বলিতে জড় প্রকৃতির কথাই মনে করিয়াছেন। জড় প্রকৃতি অপেক্ষা শিল্প উচ্চস্তরের। শিল্পী যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন জড় বস্তুতে তাহা দেখা যায় না। বেলোরীর কথায় বলিতে পারি, "শিল্পী জড় প্রকৃতির উচ্চে শিল্পকে স্থাপিত করেন।"

কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন চিত্রকেই সাহিত্য বলে না। চিত্রগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া গতিদান করেন সাহিত্যিক। এখানে যে সব মানুষগুলিকে আমরা পাই তাহাদের প্রত্যেকেরই কার্য্য করিবার এক বিশেষ ভঙ্গী আছে এবং এই কার্য্যও প্রত্যেকের মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্বও বিশ্লেষণ করেন সাহিত্যিক। বিচ্ছিন্ন চরিত্রগুলিকে ঐক্যদান করিবার সময় এবং চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কার্য্যে সাহিত্যিক তাঁহার নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন। তিনি যেমন করিয়া দেখেন তেমন করিয়াই প্রকাশ করেন, তাই এই প্রকাশে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের ছাপ কিছু না কিছু লাগিয়াই যায়। এইরূপেও জড় প্রকৃতিতে সাহিত্যিকের মনের রং লাগিয়া যায়।

সাহিত্য রস সৃষ্টি করিয়া আমাদের আনন্দ দেয়। এখানে ভাবকে রসে পরিণত করা হয়। ভাবাবেগ উদ্দীপিত করিয়া পাঠকদের দিয়া একটা কিছু করাইয়া লওয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। যদি তাহাই হইত তবে সমালোচক অতুল গুপ্তের কথায় বলিতে পারিতাম, "মনে যাতে ভাব উদ্বুদ্ধ হয়, তাই যদি

কাব্য হত, তবে আজ বাংলাদেশে যে-সব হিন্দু মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হত। কারণ, অনেক হিন্দু মুসলমানের ক্রোধই তাতে জাগ্রত হচ্ছে।" সুতরাং বস্তুকে যদি কেবলমাত্র বস্তুরূপেই সাহিত্যে ধরিয়া দেওয়া সম্ভব হইত তবে তাহার ফলে ভাবজগতেই একটা চাঞ্চল্য দেখা দিত মাত্র—সে সাহিত্য পদবাচ্যই হইত না। তাই কেবলমাত্র যাহা দেখিতেছি তাহার অনুকরণ করিয়াই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।

এই দেখার ব্যাপারেও আবার নানা সমস্যা আছে। বস্তুকে যে ভাবে দেখিতেছি তাহাই তাহার সব কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে সূর্য্যরশ্মিতে রহিয়াছে সাতটা রং—সমস্ত পদার্থের মূলে রহিয়াছে ইলেক্ট্রোন-প্রোটোন। অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয় গোচর হইতেছে তাহাই সব নহে—অনেকক্ষেত্রে তাহা মিথ্যাও বটে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি ও অনুভূতিকে মিলাইয়া আমরা সত্যের পথে অগ্রসর হইয়াছি। সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা সাহিত্যিক যাহা দেখেন তাহার সহিত নিজের মনের ভাব মিলাইয়া দিবার অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। কল্পনার পাখা মেলিবার জন্যই যে তিনি ইহা করেন তাহা নহে, সত্যে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি বস্তুকে ভাবজগতে টানিয়া লন। অনুভূতির স্পর্শে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর যে রূপান্তর তাহাকেই তিনি সত্য বলিয়া মনে করেন। এই সত্যই সাহিত্যের সামগ্রী হইবার উপযুক্ত।

সাহিত্যিকের জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক সাহিত্যের কাজ পাঠকদের আনন্দ দেওয়া। এ্যারিষ্টটলের মতে, কবিতা এবং সমস্ত প্রকার চারুশিল্পের লক্ষ্যই হইতেছে আনন্দ দেওয়া। ড্রাইডেনও তাহাই মনে করেন—যদি তাঁহার কাব্য মানুষকে আনন্দ দিতে পারে তবেই তিনি খুশী। শিল্প আনন্দ দিতে পারে তখনই যখন তাহা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। এই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বস্তুর প্রয়োজন বটে কিন্তু বস্তুর নিজস্ব কোন সৌন্দর্য্য নাই। পাথরের স্তূপকে কাটিয়া যখন কোন রূপ দেওয়া হয় তখনই তাহা সুন্দর দেখায়। এই রূপ ভাবের প্রকাশ ছাড়া আর কি? আকাশে যখন মেঘের খেলা দেখি তখন তাহাকে সুন্দর বলি। মেঘগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সুন্দর নহে, তাহাদের সেই বিশেষ সমাবেশই সুন্দর। প্রকৃতিতে যে সৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে তাহাই এই বিশেষ সমাবেশ ঘটাইয়াছে, সৃষ্টি বলিয়াই তাহা সুন্দর। সাহিত্যিকও যখন বিভিন্ন বস্তুকে একত্রিত করিয়া এক বিশেষরূপে বিন্যস্ত

করেন এবং তাহাতে নিজ মনের ভাব প্রবিষ্ট করান তখনই তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। হেগেল বলেন, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে যখন ভাবের দ্যুতি দেখা যায় তখনই তাহা সুন্দর হইয়া ওঠে। সাহিত্য দর্পণকারও বলেন, বস্তু সুন্দর হইতে হইলে তাহাতে রস থাকা আবশ্যক। রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। যে পরিমাণে বস্তু আমাদের মনে রস উদয় করিয়া দেয়, উহা সেই পরিমাণে সুন্দর। সুতরাং মনের রঙ্গে না রাঙ্গাইলে বস্তু সুন্দর হয় না।

তাই যদি কেহ বলেন যে বস্তু যেমন আছে তেমনি ভাবেই সাহিত্যে চলিতে পারে এবং তাহাতে আমাদের মনের স্পর্শ দিবার কোন প্রয়োজন নাই তবে তিনি নিতান্তই গায়ের জোরে কথা বলিতেছেন বুঝিতে হইবে। বস্তু ও ভাব না মিলিলে সাহিত্য সৃষ্টিই হইতে পারে না। আবার যদি কেহ বলেন যে বস্তুকে বাদ দিয়া কেবল ভাব রাজ্যেই বিচরণ করিব তবে বুঝিতে হইবে যে তিনিও বাতুল হইয়াছেন। আকাশ এবং সৌধ এই উভয়কেই জানি বলিয়াই ত' আকাশে সৌধ নির্ম্মাণ করা অসম্ভব নহে। পৃথিবীর মাটীতে যাহাকে কোন আকারে দেখি নাই তাহাকে কল্পনা করিতে পারি না। ঈশ্বর কল্পনায়ও এই কথাই খাটে। প্রচণ্ড ঝড়ের শক্তি দেখিয়াছি, জলপ্রপাতের ভয়াবহ রূপ দেখিয়াছি, প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যেও শৃঙ্খলা দেখিয়াছি তাই সর্ব্বশক্তিমানের কল্পনা সম্ভব হইয়াছে। এই সর্ব্বশক্তিমান যাহা খুসী করিতে পারেন, যাহা খুসী হইতে পারেন—সর্ব্বদিক দিয়াই অসীম তাহার শক্তি তাই তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু যেহেতু বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত আমরা কিছু কল্পনা করিতে পারিনা, সেই হেতু ভাবরাজ্যে ঈশ্বরকে নিরাকার কল্পনা করিলেও আদর্শ রক্ষা করিতে আমরা পারি নাই। তাই হিন্দুরা দেবদেবী সৃষ্টি করিয়াছে, ক্রীশ্চানেরা ঈশ্বরের পুত্রকে মর্ত্ত্যে টানিয়া আনিয়াছে, মুসলমানরা কোরাণকে আল্লার বাণী বলিয়া মনে করিয়াছে। তাই একথা অস্বীকারের উপায় নাই যে বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত আমরা কোন কিছু চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং বস্তু ব্যতীত শিল্পও সম্ভব নহে। ভীসার বলেন, কেবলমাত্র বস্তুর অনুকরণ করিয়া শিল্পী সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন না। তিনি ফটোগ্রাফারের ন্যায় নকলনবীশও হইতে পারেন না আবার জড় প্রকৃতিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র কল্পনার জগতেই বিচরণ করিতে পারেন না কারণ কেবলমাত্র কল্পনা রূপকথাই সৃষ্টি করিতে পারে। তিনি জড় প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার গোপন রহস্য আবিষ্কার করেন।

ইন্দ্রিয়দ্বারে বস্তুকে যেমন দেখি তাহাই যে বস্তুর সব নয় তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছেন। সমস্ত পদার্থের মূলে ইলেক্‌ট্রোন্‌-প্রোটোন তাহাও আমরা জানি। কিন্তু বিবাহ বাড়ীতে পাতে লুচী-সন্দেশের পরিবর্ত্তে যদি মাটীর ঢেলা ও পাথর কুচি দিয়া কন্যার পিতা অভ্যর্থনা করেন তখন আমাদের মনের অবস্থা কি হয়? পাগলকে কাঁচ খাইতে দেখিয়াছি—মনের অস্তিত্ব লোপ পাইলেই বোধ হয় ইহা সম্ভব। শিশুরও মন পরিণত নহে বলিয়াই সে সচ্ছন্দে যাহা পায় তাহাই মুখে পুরিয়া দেয়। তাই যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ বস্তুর বিশেষ প্রকাশকে মানিয়াও লই আবার তাহার উপর রঙও বুলাই। সাহিত্যিকেরও মন রহিয়াছে, পাঠকদেরও মন আছে। তাই সাহিত্যের বস্তু বস্তুও বটে আবার বস্তুর অতিরিক্ত কিছুও বটে।

শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্ণামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি ক'রে যে এই দুটোকে ভাগ করে' লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিষটা মানুষের সৃষ্টি, সে Nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিষই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে; কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র সৃষ্টি কি এতই সহজ?" শরৎচন্দ্রকে বাস্তববাদী বলা হয় কেন? তাঁহার উপন্যাসে যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, যে চরিত্রগুলি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বাস্তব জগতে তাহাদের যথাযথ অনুকৃতি না দেখিলেও অসম্ভব বিলয়া বাতিল করিয়া দিতে পারি না। কিন্তু চিত্রগুলি তিনি যে ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং উহাদের পরিপ্রেক্ষিতে চরিত্রগুলিকে তিনি যে রূপদান করিয়াছেন তাহার ফলে আমরা কি পাইয়াছি? আর কিছু না পাই এটুকু বুঝিয়াছি যে তিনি সুহৃদ সম্মিত উপায়েই হউক অথবা কান্তাসম্মিত উপায়েই হউক কিছু একটা বলিতে চাহিয়াছেন। এই সব চিত্র ও চরিত্রের মধ্যে যে জটিলতা তাহা আমাদের নানা সমস্যার কথা অনুভূত করায়। লেখক সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া দিলেও সেগুলি আমাদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শেষ মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তোলে। ইহা আদর্শবাদ ব্যতীত আর কি? ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত বড় সুন্দর করিয়া এই কথাটাই বলিয়াছেন, "মজার

কথা এই,—একদিকে আমরা আমাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিপীড়িত দুর্বলের বুকের অস্ফুট বেদনাকে ভাষা দিতেছি,—মানুষের মনের গহনের দুর্জ্ঞেয়ত্বের ভিতরে আলোকপাত করিতেছি, মুটে-মজুর এবং অসংখ্য কল-কারখানার শ্রমিকরূপ 'ভুখা ভগবান্'দের জয়গান করিতেছি, এবং ইহা লইয়াই বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাইতেছি,—অন্যদিকে আবার প্রমাণ করিতে লাগিয়া গিয়াছি যে, সাহিত্যের রসবোধের সহিত আমাদের শ্রেয়োবোধের কোনই সম্পর্ক নাই।"

শ্রেয়োবোধকে তফাতে রাখিবার উপায় কোথায়? সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে গেলে শ্রেয়োবোধ যে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। চোখে যাহাকে সুন্দর দেখিতেছি, মনেও যদি তাহাকে সুন্দর না দেখি তবে তাহা আমাদের কতক্ষণ আকর্ষণ করিতে পারে? স্ত্রী যদি হৃদয়হীনা হয় তবে দেহের দিক দিয়া যতবড় সুন্দরীই সে হউক না কেন আমাদের চিত্ত জয় করিতে পারে না। ইতর জনোচিত দৃষ্টি লইয়া তাহাকে সুন্দর বলিতে পারি, কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে পারি কি। দেহের বিচারে অসুন্দরও আবার মনের সৌন্দর্য্যের জন্য আমাদের তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়। অন্তরের রস মাধুর্য্যই ইহার জন্য দায়ী—ইহা শ্রেয় বলিয়াই অধিক তর সুন্দর। তাই প্রেয়োবোধ অপেক্ষা শ্রেয়োবোধই আমাদের সত্যকার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করায়। বর্ব্বর যুগে দেহকে লইয়াই কাজ মিটিয়াছে কিন্তু সভ্যযুগে দেহকে ছাড়াইয়া গিয়াছে মন। তাই এযুগে নারী হইলেই নরের চলেনা—সে চায় সুন্দরমনা নারী। তাহার অন্তর যত বড় হইবে ততই বেশী হইবে পুরুষের তৃপ্তি। সে শুধু নারী হইবে না, তাহাকে হইতে হইবে আদর্শ নারী।

মানুষের বিচরণের ক্ষেত্র যে অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার চাওয়া। শাস্ত্রকার ঋষিরা জগৎকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের চিন্তা কেন করিতেন—ইহজগতের ভোগ অপেক্ষা মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেন তাঁহারা ব্যাকুল থাকিতেন? নিছক ভাবের আবেগেই কি দিনের পর দিন শত শত আশ্রমবাসী অযথা সময় ক্ষেপন করিতেন? বুদ্ধ-যিশু-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ কি কিছুই পান নাই? আমাদের মন বলে, নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন এবং এমন কিছু পাইয়াছিলেন যাহা এই জগতের সব পাওয়া অপেক্ষাও বড়, এমন কিছু পাইয়াছিলেন যাহা পাইলে বস্তুর দিকে আর দৃষ্টিও থাকেনা। রসো বৈ সঃ—সমস্ত রসের আধার তিনি, জগতের সৌন্দর্য্যের মূলেও তিনি। এই মূলকে যাহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের অন্ত

কিছুতে আর কিসের প্রয়োজন? ইঁহাদের অন্তর পূর্ণরূপে বিকশিত বলিয়াই ইঁহারা পরম সুন্দরকে চাহিয়াছিলেন। তাই অন্তর থাকিতে শ্রেয়োবোধকে বাধা দিবার উপায় কি? আমাদের অন্তরও তাই বস্তুতেই সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ দেখেনা—বস্তুকে অতিক্রম করিয়া শ্রেয়োবোধের মধ্যে সে তৃপ্তি পাইতে চায়। তাই আদর্শকে বাতিল করিবার কোন উপায় নাই।

সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্য্যকে বড় করিয়া দেখা যায়না। এই মনের দৃষ্টি লাভ করা বিশেষ শিক্ষার কর্ম্ম।

"মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধি বিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায়; ধর্ম্ম-বুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

"অতএব, যে দেখাতে আমাদের মনের বড়ো অংশ অধিকার করে সেই দেখাতেই আমরা বেশী তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্য্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশী টানে, কেননা মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়, তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি হৃদয়ের লাবণ্য আছে; তাহারা আমাদের চৈতন্যকে বুদ্ধিকে হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। তাহা আমাদের কাছে শীঘ্র ফুরাইতে চাহে না।" এই ফুরাইতে না দিবার ইচ্ছাতেই সাহিত্যিক বস্তুকে অবলম্বন করিয়াও বস্তুকে অতিক্রম করিয়া যাইতে বাধ্য হন। কেবলমাত্র মানুষের মঙ্গল করিবার উদ্দেশ্যেই যে তিনি শ্রেয়কে টানিয়া আনেন তাহা নহে, সৌন্দর্য্যের তাগিদেই তিনি আমাদের শ্রেয়র দিকে ঠেলিয়া দেন।

এইবার শেষ প্রশ্নটা বিচার করিয়া দেখা যাক। বাস্তববাদ বলিতে কেবলমাত্র বস্তুকেই আমরা বুঝিব কেন? আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিও ত' বাস্তব। সন্তানের প্রতি মাতার ভালবাসা, নরনারীর প্রেম জগতের দৃশ্যমান বস্তুগুলি হইতে ত' কোন অংশে কম বাস্তব নহে। সুতরাং বাস্তববাদী সাহিত্যে বস্তুর সহিত এই প্রেম-প্রীতির কথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াই ত' থাকিবে। এই কথাটা স্বীকার করিলে বোধ হয় বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের লড়াইয়ের মীমাংসা করা সহজ-

হইয়া যায়। কারণ আদর্শবাদে এই বাস্তববাদের সহিত ঔচিত্যবোধ শুধু মিশিয়া থাকে। পল্লীসমাজের স্বাভাবিক চিত্র আঁকিয়া শরৎচন্দ্র জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শুধু ইহাই বলিলেন যে বর্ত্তমান পল্লীসমাজে রমার মত মহীয়সী নারীর আশ্রয় লাভ সম্ভব নহে, রমেশের মত বিরাট হৃদয়ও শত সহস্র বাধার সম্মুখীন হইয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলিবে মাত্র। মানুষের জগতে যাহা তিনি দেখিয়াছেন তাহাকে সজীব মূর্ত্তি দান করিয়া তিনি যাহা দেখিতে চাহেন তাহাই বলিলেন। কৃত্রিমতার জালে আবদ্ধ হইয়া মানুষ নিজেকে ভুলিতে বসিয়াছে, সাহিত্যিক তাহার স্বরূপই শুধু প্রকাশ করেন। আমাদের দৃষ্টিতে উহা মানুষের আদর্শ রূপ হইতে পারে—সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে উহাই তাহার প্রকৃত রূপ। কৃত্রিমতার আবরণ ভেদ করিয়া সাহিত্যিক-দ্রষ্টা আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করেন, আমাদের দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন বলিয়াই তাহাকে আমরা আদর্শবাদ বলিয়া বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া থাকি। সুতরাং নিছক বাস্তববাদ বলিয়া কিছু নাই।

বাস্তববাদ কথাটা কি তবে সম্পূর্ণ অবাস্তব? মানুষের যে রূপ সাহিত্যিকের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায় তাহাকে তিনি নানা উপায়ে প্রকাশ করিতে পারেন। এই উপায়ের মধ্যেই আমাদের বাস্তববাদের সন্ধান লইতে হইবে। সাহিত্যিক যদি অস্বাভাবিক ঘটনা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কথা বলেন তবে আমরা বলিব তিনি বাস্তবকে গ্রহণ করেন নাই। মানুষের যে রূপ তিনি এই উপায়ে প্রকাশ করেন তাহা তাহার প্রকৃত রূপ হইলেও এই রূপায়ণকে আমরা অবাস্তব বলিয়া থাকি। কিন্তু অস্বাভাবিক ঘটনা সৃষ্টি না করিয়া বাস্তব-জগতে আমরা প্রতিনিয়ত যাহা দেখি এবং দেখিবার আশা করি তাহারই ভিতর দিয়া যদি তিনি সেই কথাই বলিতেন তবে তাহা বাস্তবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিত। সাহিত্যিকের অঙ্কিত চিত্রগুলি যদি বাস্তব অনুসারী হয়, তাঁহার মানুষের হৃদয় বিশ্লেষণ যদি বিজ্ঞান সম্মত হয় তবেই সেই বিশেষ রূপায়ণকে আমরা বাস্তব বলিতে পারি। তাই নিছক বাস্তববাদ বলিয়া সাহিত্যে কিছুনা থাকিলেও রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাই অতুল গুপ্ত যখন বলেন, "কোন্ কবি কোন কাব্য-কৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর। এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকে কাব্যের জগৎ থেকে নির্ব্বাসন দেবার অধিকারী নয়।" তখন

একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই যে তিনি বস্তুতন্ত্র বলিতে পাশাপাশি রূপিকৃত বস্তুকে বুঝিয়াছেন। তাহা যদি হইত তবে রস সৃষ্টি হইতেই পারিত না। তাঁহার উক্তির মধ্যে 'কাব্য-কৌশল' কথাটা বিশেষরূপে লক্ষণীয়। সৃষ্ট হইবে কাব্য কিন্তু কৌশলটা রোমাণ্টিক, ক্লাশিক বা স্বভাব অনুগত হইতে পারে। যে কাব্য যতটা স্বভাব অনুগত সে কাব্য ততটা বাস্তব অনুসারী ইহাই আমরা বলিতে পারি। কিন্তু শেষ কথা এই যে উহা কাব্য—সুতরাং সৃষ্টি। জোর করিয়া তাহাকে ফটোগ্রাফ করিয়া তোলার কোন উপায় নাই। সুতরাং সাহিত্য মাত্রেই আদর্শ থাকিবে, কৌশলটা বাস্তব ঘেঁষা হইতে পারে মাত্র।

ষ্টাইল

সাহিত্যের সামগ্রীতে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিত ভাবে বুঝায়, কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "দিঘি বলিতে জল এবং খনন করা আধার দুই একসঙ্গে বুঝায়। কিন্তু কীর্ত্তি কোন্‌টা। জল মানুষের সৃষ্টি নহে, তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্ত্তিমান মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্য সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই লেখকের কীর্ত্তি।"

'উপায়-রচনা'টা লেখকের কীর্ত্তি নিশ্চয়ই, কিন্তু উপায় রচিত হয় কোন্ উপায়ে? দীঘির খনন করা আধারের উপরই তাহার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে সত্য কিন্তু অকস্মাৎ একদিন বহুলোক কোদালি লইয়া মাটী কোপাইয়া দীঘির সৃষ্টি করে না। সেতু তৈয়ারী করিবার বাসনায় কেহ ইচ্ছামত লোহা ও ইট-কাঠ সাজাইয়া যায় না। সেতু শিল্পীর কল্পনায় বহু পূর্ব্বেই ধরা দেয়—তাহার জন্য তাঁহাকে অনেক আঁক-জোক কষিতে হয়। যখন সেতুর সম্পূর্ণ রূপটী শিল্পীর কল্পনায় ধরা দেয় তখনই ডাক পড়ে হাজার লোকের। শিল্পীর ভাব-কল্পনায় সেতুর যে রূপটী মূর্ত্তি গ্রহণ করে মজুরেরা তাহাকেই লোহা ও ইট-কাঠ সাজাইয়া আকার দেয়। দীঘির বেলায়ও তাহাই হয়। রূপদক্ষ কোদালি চালাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই কল্পনায় দীঘির রূপ দিতে থাকেন। মনে-মনে বহুবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তিনি তাহাকে মনের মত করিয়া গড়িয়া তোলেন। কল্পনায় যাহা রূপ গ্রহণ করে বাহিরে তাহারই পক্ষে কেবল রূপ পাওয়া সম্ভব। কল্পনায় স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে যাহা পারে না বাহিরে তাহাই খোঁড়াইয়া চলে। সুতরাং 'উপায়-রচনা'কে ভাব-কল্পনার উপরই নির্ভর করিতে হয়। সোপেনহাওয়ার তাই বলিয়াছেন, "উপযুক্ত চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হইলে তাহা প্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হয়।"

লেখক কি করেন? জগতের নানা বিষয় তাঁহার মনকে আলোড়িত করে। তাহারই ভিতর হইতে তিনি তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যের বিষয়বস্তু বাছিয়া লন এবং তাহাকে কল্পনায় পূর্ণরূপ দিতে থাকেন। কল্পনায় রূপ দেওয়ার কাজ শেষ হইলেই তিনি তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারেন। সুতরাং 'বিশেষ মূর্ত্তিতে সর্ব্ব-লোকের আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনা' করিতে লেখককে নিজের ভাব-কল্পনার উপরই নির্ভর করিতে হয়। ক্রোচেও তাই বলেন যে, ভাব-কল্পনার সহিত রূপায়ণের কাজ যুক্ত হইবার ফলে সাহিত্য-নয়। সাহিত্যে ভাব-কল্পনাই রূপায়িত হইয়া ওঠে। রূপায়ণের সহিত ভাবকে পৃথক করিবার কোন উপায় নাই। লেখক যেমন করিয়া ভাবিবেন তেমন করিয়াই তাহা রূপ গ্রহণ করিবে। সাহিত্য বলিতে সাহিতত্বই বুঝায়—এখানে ভাবে ও ভাষায় যে মিলন ঘটে তাহার মধ্যে কোন ভেদ সৃষ্টি করিবার উপায় নাই। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এই কথাটাই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, "অতএব এই যে প্রকাশ ভঙ্গিমা বা ভাবের ভাষারূপ, তাহা এমন একটি সৃষ্টি, যাহা লেখকের ব্যক্তিসত্তা বা আত্মব দৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য হইয়া আছে, লেখা হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া লওয়া যায় না, এই জন্য আসল Idiosyncracy of Style অনুকরণ করিবার নয়, তাহা যদি সম্ভব হইত, তবে একজনের ব্যক্তিত্ব অনায়াসে অপরের হইতে পারিত—চোখ মুখ ভিন্ন, কিন্তু কণ্ঠস্বর এক হইতে পারিত।"

যদি ভাবকে তাহার বিশেষ মূর্ত্তি হইতে পৃথক করা যাইত তবে শকুন্তলা-কুমারসম্ভবও ভাব বজায় রাখিয়া অনুবাদ করা সম্ভব হইত এবং উহাদের প্রকাশ ভঙ্গীমাও অনুকরণ করা চলিত। জ্ঞানের কথার অনুবাদের মতই হয়ত' তাহার কোন এক বিশেষ অনুবাদ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। কালিদাসের বাণীভঙ্গীর সাক্ষাৎও নানা কবির মধ্যে দেখিতে পাইতাম। তবে উজ্জয়িনীর কবির অদৃষ্টে কি ঘটিত কে বলিতে পারে। কিন্তু ইহা সম্ভব নয়, তাই কালিদাস অপেক্ষা বড় কবি পাইতে পারি কিন্তু দ্বিতীয় কালিদাস আর পাইব না। সাহিত্যের সামগ্রীতে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটাও বলিয়াছেন, "তাহা (ভাবের বিষয়) যে-মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।" ইহার একমাত্র কারণ এই যে প্রতিটী মানুষের ভাবিবার ধরণ আলাদা। যে মানুষের ব্যক্তিত্ব নাই তাহার কোন বৈশিষ্ট্যও নাই—গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় তাহার জীবন একটানা বহিয়াই যাইবে,

রূপদক্ষ হইতে সে কোনদিন পারিবে না। যাঁহার ব্যক্তিত্ব আছে তিনিই কেবল সৃষ্টি করিতে পারেন। চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সাহিত্যে, খেলার মাঠে এমন কি তাসের আড্ডায়ও এই সব ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। চিত্রে তিনি নিজস্ব বিশেষ রীতিতে তুলির আঁচড় কাটেন, খেলার মাঠে তাঁহার বল লইয়া যাইবার পদ্ধতি চমৎকার—ইহাকেই ত' বলি সৃষ্টি! তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্যবোধ তাঁহাকে তুলির আঁচড় টানিতে শিখাইয়াছে, বল কাটাইয়া লইবার কায়দা শিখাইয়াছে। এই ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশকেই বলি ষ্টাইল। ভাব-কল্পনা যত সুসংবদ্ধ ও সরল হয় প্রকাশ ভঙ্গীও ততই সুন্দর হয়। সোপেনহাওয়ার তাই মনে করেন যে, প্রকাশ ভঙ্গী ভাব-কল্পনার ছাঁচ মাত্র।

ষ্টাইল কথাটা ল্যাটিন এবং তাহার অর্থ ইস্পাতের কলম। ইস্পাতের কলম বলিতে বুঝি শক্তিশালী লেখনী। সাহিত্যের কাজ হৃদয়কে স্পর্শ করা, আকর্ষণ করা। সুতরাং যে লেখা আমাদের হৃদয়কে যতবেশী স্পর্শ করিতে পারে, আকর্ষণ করিতে পারে সে লেখাকে ততবেশী শক্তিশালী বলিব। বুদ্ধি দিয়া এ-কাজ করা যায় না—হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে হৃদয়ই মাত্র পারে। তাই লেখক যখন ভাবে বিভোর হইয়া লেখার মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দেন তখনই মাত্র তিনি অন্যের হৃদয়ের দ্বারে পৌছিতে পারেন। তাই ষ্টাইলে হৃদয়ের এক বিশেষ স্থান আছে বলিয়াই পেটার মনে করেন। উহা এক রহস্যময় উপায়ে শব্দ চয়ন করিয়া ভাবকে রূপদান করে। যিনি বাছিয়া বাছিয়া লাগসই শব্দ সন্ধান করিয়া বেড়ান তাঁহার লেখায় ষ্টাইল থাকে না—সুতরাং ব্যাকরণে ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ দখল থাকিলেই সুন্দর ষ্টাইল-স্রষ্টা হওয়া যায় না। ভাবের মুখে হৃদয়ের ইঙ্গিতে নিজস্ব শব্দ যখন বাহির হইয়া আসে তখন তাহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই থাকেনা—দুর্ব্বল শব্দও কল্পনার সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। ওয়াল্‌টার র‍্যালের মতে কেবলমাত্র এইরূপ শব্দ যোজনার ফলেই লেখা উজ্জ্বল এবং সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়। ভাব-কল্পনা আপন প্রেরণাতেই যখন রূপায়িত হইয়া ওঠে তখনই কেবল ইহা সম্ভব।

তবে কি সুন্দর রূপ সৃষ্টির জন্য লেখকের নিজের কিছুই শিখিবার নাই? নিশ্চয়ই আছে। আমরা চিত্রের দ্বারা বা কথার দ্বারাই কল্পনা করিয়া থাকি। জাহাজে চড়িয়া কোথাও যাইতেছি কল্পনা করিতে হইলে এক গতিশীল জাহাজের

ছবি আমাদের মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে। জাহাজের কথা জানা না থাকিলে জাহাজের কল্পনাও আমরা করিতে পারিতাম না। সুতরাং যে লেখকের অভিজ্ঞতা কম তাঁহার ভাবিবার ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ—তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুও অতি সাধারণ হইতে বাধ্য। এই বিষয়বস্তুর প্রকাশে ভাবে ও ভাষায় পূর্ণ সাযুজ্যই ষ্টাইল হইলেও রচনার বিচারে তাহার মূল্য খুব বেশী নয়। অপর দিকে, লেখকের প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকিলেই তাঁহার ভাব-কল্পনা গভীর ও ব্যাপক হইতে পারে—এ অবস্থায় রচনার মূল্যও বাড়িয়া যায়। কল্পনায় যাহাকে আমি সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করি তাহাকেই বাহিরে প্রকাশ করি—সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার ধারণার উপর রচনার সৌন্দর্য্যও নির্ভর করে। বর্ব্বর যুগের মানুষের যে সৌন্দর্য্যের ধারণা ছিল আজিকার দিনে আর তাহা নাই। লেখক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা হৃদয়ের বিকাশ করিয়া সৌন্দর্য্যবোধের শক্তিও বৃদ্ধি করিতে পারেন। সুতরাং ষ্টাইল শিক্ষা করা না গেলেও রচনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য লেখকের শিক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। লাগ্‌সই শব্দ ব্যবহার করিলেই যেমন রচনা সুন্দর হয় না তেমনি শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা না থাকিলেও রচনাকে সুন্দর করিয়া তোলা যায় না। এক রহস্যময় উপায়ে হৃদয় উপযুক্ত শব্দটী লেখনী মুখে আনিয়া দেয় বটে কিন্তু শব্দটী আকাশ হইতে নামিয়া আসে না, লেখকের তাহা জানা থাকা চাই। তাই রচনা সুন্দর করিবার জন্য লেখককেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়—গুণীদের সৃষ্টি কৌশল শিক্ষা করিতে হয়, বাক্য রচনা পদ্ধতি জানিয়া লইতে হয়।

মোহিতলাল বলিয়াছেন, "কবির ভাষা বিজ্ঞান-দর্শনের ভাষা নয়—এই ভাবকে মূর্ত্তি দিতে হইলে, ব্যাখ্যা বা বিবৃতিই যথেষ্ট নয়; তাঁহার বাক্যযোজনা—ভাবেরই অঙ্গযোজনা তাঁহার ভাষা ভাবেরই প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ।" ভাবের মুখে যে কথাগুলি বাহির হইয়া আসে তাহার কোনটাই কি তবে পরিবর্ত্তন করিবার উপায় নাই? এই কথাটাই বা মানি কেমন করিয়া? কপালকুণ্ডলায়, রজনীতে তবে বঙ্কিম নূতন করিয়া হাত দিয়াছিলেন কেন? রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাণ্ডুলিপির কাঁটাছেঁড়ার ছবিও ত' আমরা দেখিয়াছি। কেন এমনটী হয়? ইহার উত্তরে সোজা করিয়া বলা চলে যে সৌন্দর্য্যবোধ পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। লিখিবার বহুদিন পরে যখন পরিবর্ত্তন করা হয় তখন এই উত্তর মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লিখিয়া বার বার কাটিয়াও যে লেখকের তৃপ্তি হয় না

দেখিয়াছি। তাই 'মনে হয় এত' সোজা করিয়া উত্তর দিলে আসল কথাটাই হয়ত' চাপা পড়িয়া যাইবে। আসল কথাটা তবে কি হইতে পারে?

দুইদিক দিয়া বিষয়টা বিচার করিয়া দেখিতে পারি। প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের জগৎ অপেক্ষা মনের জগৎ সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম জগতে যাহা রূপ গ্রহণ করে তাহাকে ইন্দ্রিয়ের জগতে তত সূক্ষ্ম করিয়া সৃষ্টি করা যায় না—

মনে যাহা ছিল হ'য়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দ আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি'

—তাই সৃষ্টি করিয়াও লেখক কখনও তৃপ্তি পান না। ইন্দ্রিয়ের জগতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন নিজের সৌন্দর্য্য বোধের সহিত তাহাকে মিলাইবার জন্যই তাই তিনি বার বার লেখনীর আঁচড় কাটেন। এই কারণেই অনেক শব্দ এবং বাক্যকে পরিবর্ত্তন করিতে তিনি বাধ্য হন। তবেই দেখিতেছি ভাব-কল্পনার সহিত রূপায়ণ সম্পূর্ণ সাযুজ্য লাভ করিতে পারে না। তাই ষ্টাইলও পূর্ণতা পায় না।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কাহারও কল্পনায় কোন কিছুর পরিপূর্ণ রূপ ধরা পড়ে না। তাই চিত্রকরকে ছবি আঁকা শেষ করিয়াও নানা দিক হইতে চিত্রটীকে দেখিয়া বহুবার তুলির সূক্ষ্ম আঁচড় টানিতে হয়—শেষ আঁচড় টানিয়াও যে তাঁহার তৃপ্তি হয় এমন মনে হয় না। সৌন্দর্য্যবোধ তাঁহাকে যতদূর লইয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া তিনি যাইতে পারেন না। নিজের এই সৌন্দর্য্যবোধের সহিত তাই তিনি বার বার চিত্রটী মিলাইয়া দেখেন। রচনার ক্ষেত্রেও তাহাই হয়। লেখা শেষ করিয়া বহুবার পাঠ করিয়া লেখক নিজের সৌন্দর্য্যবোধের সহিত মিলাইয়া এখানে সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করেন। সুতরাং ভাবের আবেগে লেখা হইলেও সব সময়ে উপযুক্ত শব্দটী লেখনীর মুখে যোগায় না—কল্পনায় কোন কিছুর পরিপূর্ণ রূপ ধরা পড়ে না বলিয়াই বোধ হয় ইহা হয়। তাই সৃষ্টির পরেও লেখনী বুলাইয়া রচনাকে সুন্দর করা যায়। সৌন্দর্য্যবোধের উপরই এই লেখনী বুলান নির্ভর করে।

সুতরাং যেদিক দিয়াই বিচার করি না কেন লেখকের সৌন্দর্য্যবোধের উপরই যে রচনার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। লেখকের সৌন্দর্য্যবোধের উপরই আবার তাহার ভাব-কল্পনার সূক্ষ্মতা নির্ভর করে—প্রকাশভঙ্গী এই ভাব-কল্পনারই একটা মোটামুটী ছাঁচ। তাই লেখকের সৌন্দর্য্যবোধ যত পূর্ণতা পাইবে তাঁহার ষ্টাইলও ততই মনোমুগ্ধকর হইবে। ষ্টাইলকে সুন্দর করিতে হইলে সৌন্দর্য্যবোধের শক্তি বৃদ্ধি করা চাই।

হাস্যরস ও কমলাকান্ত

স্বাভাবিক যাহা, যেমনটি আমরা আশা করি তাহার ব্যতিক্রমেই হাস্যরস সৃষ্ট হয়। অকস্মাৎ কাহারও পদস্খলন হইলে দর্শকেরা হাসিয়া ওঠে। পড়িয়া যাওয়া মানুষের স্বভাব নহে, সাধারণতঃ ইহা ঘটেও না। যাহা সাধারণতঃ ঘটে না তাহা ঘটিতে দেখি বলিয়াই আমরা হাসিয়া উঠি।

কাহাকে আমরা স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি? যাহা দেখিয়া দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছি তাহাকেই স্বাভাবিক বলি। কিন্তু স্বাভাবিক যাহা তাহার ব্যতিক্রম মাত্রেই আমাদের হাসির উদ্রেক করে না। যে ব্যতিক্রম আমাদের মনে অন্য কোন বিশেষ ভাবের উদ্রেক করে সে ব্যতিক্রম দেখিয়া আমরা হাসি না। সাধারণ মানুষের ও প্রতিভাধরের চলন-বলন ব্যবহারে অনেক পার্থক্য আছে। প্রতিভাধরের ব্যবহার অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতে পারি কিন্তু তাহাকে হাসির খোরাক বলিয়া কখনই বিবেচনা করিনা—তিনি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া হাসিকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরাইয়া রাখেন। নূতন সাইকেল চড়া যে শেখে সে বার বার পড়িয়া যায়—দর্শকেরা হাসে বটে কিন্তু যিনি শিক্ষকতা করেন তিনি মুহূর্তের জন্যও হাসেন না, উৎসাহদানের আকাঙ্ক্ষায় তিনি হাসিকে ভুলিয়া যান। কিন্তু শিক্ষার্থীকে যখন অদ্ভুতভাবে পড়িয়া যাইতে দেখেন তখন তিনিও না হাসিয়া পারেন না—এক্ষেত্রে তাহার উৎসাহ দিবার মনোভাবকেও ঘটনার অদ্ভুতত্ব পরাভূত করিয়া দেয় বলিয়াই হাসির সৃষ্টি হয়।

তবে স্বভাবের কোন্ প্রকার ব্যতিরেকে আমরা হাসি? সুবোধ সেনগুপ্ত বলেন, 'যে অনন্য সাধারণত্বে কোন সত্য নাই তাহাই আমাদের হাসির উদ্রেক করে'। ভ্রান্তি বশতঃই যে মানুষ পড়িয়া যায় এ বোধ আমাদের আছে বলিয়াই আমরা হাসি। এই হাসির মধ্যে আমাদের একটু আত্মগৌরবের ভাবও আছে। যে পড়িয়া গেল তাহার অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করি—তাহার অক্ষমতা

আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে। হোবেস তাই বলিয়াছেন, 'আমাদের নিজেদের পূর্ব্বতন অবস্থা অথবা অন্য কোন ব্যক্তি হইতে নিজের সম্বন্ধে কোন বিষয়ে অকস্মাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হইতেই হাসির সৃষ্টি'। এই কারণেই অপর ব্যক্তির পতনে আমরা হাসিয়া উঠিলেও নিজে যখন ভূতলশায়ী হই তখন হাসিতে পারিনা। পক্ষান্তরে, কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া বার বার পড়িয়া যায় তবে আর আমাদের হাসি আসে না—তাহার ভ্রান্তি যে সত্যকার ভ্রান্তি নহে তাহা আমরা বুঝিয়া ফেলি। সুতরাং হাস্যরস জমিয়া ওঠে তখনই যখন রসিকের চিত্তে স্বাভাবিকতার ধারণা স্পষ্ট হইয়া থাকে এবং যে হাস্যরসের রসদ যোগায় সে সত্য সত্যই ভুল করিয়া রসিকের শ্রেষ্ঠত্ব বোধকে জাগ্রত করে।

কিন্তু হাস্যরসের যিনি রসদ যোগান তিনি পাকা খেলোয়াড় হইলে হাস্যরস উপভোগকারী রসিককে লইয়াও নিজে হাস্যরস উপভোগ করিতে পারেন। সার্কাসের ক্লাউনের কথা ধরিতে পারি। সে দর্শকদের হাসায় সর্ব্ববিষয়ে ভুল করিয়া; খেলাটা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা আছে, যে খেলা দেখায় তাহার কৌশল দেখিয়া কিছু পূর্ব্বেই হয়ত' আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বিস্ময়ের ঘোর হয়ত' তখনও কাটে নাই যখন ক্লাউন আসিয়া প্রবেশ করিল রঙ্গমঞ্চে এবং সেই খেলাটাই দেখাইবার চেষ্টা করিল এক অদ্ভুত উপায়ে। আপনা হইতেই মনের মধ্যে খেলোয়াড় ও ক্লাউনের পদ্ধতির তুলনা হইয়া গেল। সুতরাং ক্লাউনের কার্য্য দেখিয়া মন বলিয়া উঠিল, আঃ, লোকটা পাগল নাকি? হাসি না আসিয়া আর উপায় কি? কিন্তু এমনও ত' হইতে পারে যে এই ক্লাউন অত্যন্ত কৌশলী, হয়ত' সমস্ত খেলাতেই পারদর্শী। ইচ্ছাকৃত ভুল করিয়া সে নিজেকে উপহাসাস্পদ করিয়া আমাদের হাসাইয়াছে এবং আমাদের হাসি দেখিয়া আমাদের প্রতারিত করিতে পারিয়াছে বুঝিয়া মনে মনে সে নিজেও হাসিয়াছে। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহার চাতুর্য্য ধরিতে না পারিয়া আমরা তাহাকে পাগল মনে করিয়াছি—সে আমাদের এত' সহজেই প্রতারিত করিতে পারিয়া নিতান্ত অজ্ঞ মনে করিয়াছে। আমাদের এই অজ্ঞতার প্রতি তাহার একটা কৌতুক মিশ্রিত সহানুভূতি থাকাই স্বাভাবিক।

এই কৌশলী, ক্রীড়া পারদর্শী বঙ্কিমের কমলাকান্ত। এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির সূক্ষ্ম দৃষ্টির সম্মুখে জগৎ-ব্যাপার জলের ন্যায় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

যাহা দেখিয়া দেখিয়া আমরা 'নিয়ম' বলিয়া মানিয়া লইয়াছি তাহা কতবড় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া গেলেও তাঁহার অজানা নাই। আমরা সিভিল সার্ভিসের সাহেবদের ভয় ভক্তি করি, তিনি তাহাদের স্বভাব বেশ ভাল করিয়াই জানেন। সাহেবের বাহিরের চাকচিক্য আমাদের চমকিত করে তিনি তাহার অন্তরের সংবাদ রাখেন, তাই সহজ ভাবেই বলিয়া বসেন, 'আম্র দেখিতে রাঙ্গা রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। ....সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলামজলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও—যদি জোটে, তবে সে জলে একটু খোশামোদ-বরফ দিও—বড় শীতল হইবে। তারপর ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার' (মনুষ্য ফল)। অমন টক্‌টকে সাহেব রাঙ্গা আমের মত এবং তাহাকেও যে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায় তাহা শুনিয়া আমাদের ঠোঁটের কোণে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়।

কমলাকান্তের ন্যায় চরিত্র বাঙ্গলা সাহিত্যে আর নাই। হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা ইহার পূর্ব্বেও হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম পেঁচার নক্সায়' বাবুদের আচার-ব্যবহার লইয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসির খোরাক জোগাইবার চেষ্টা আছে, দীনবন্ধু 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'কে লইয়া রঙ্গরস করিয়াছেন, চোরকে লইয়া স্বামী ভ্রমে দুই সতীনের লড়াই দেখাইয়াছেন, কমলাকান্তের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেই বঙ্গদর্শনে 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' প্রেরণ করিয়াছেন—পুরাতন সাহিত্যের বিবাহ-বাসর ও পতি নিন্দার সংবাদও আমরা রাখি। কিন্তু সে-সমস্তই মানুষের আচার-ব্যবহার লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের এবং রস সৃষ্টির চেষ্টা। এই হাল্কা হাসিতে কমলাকান্তের মন সায় দেয় নাই। দুঃখের সংসারে কিছুটা হাসির রেশ ছড়াইয়া দেওয়াও মন্দ নয়—কালীপ্রসন্ন-দীনবন্ধুতে তাহাই দেখি। কিন্তু ভিখারীকে দুই চারিপয়সা দান করিয়া কতটা মঙ্গল সাধন করা সম্ভব? ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সমাজের মূল ধরিয়া টান দিয়া ভিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই দূর করিয়া দিতে চাহেন। কমলাকান্তের মূল আকাঙ্ক্ষা তাহাই এবং সেই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি মানুষের স্বভাব ধরিয়া টান দিয়াছেন। স্বভাবের মধ্যে যে অন্যায়, সমাজের পরতে পরতে যে অন্যায় তাহারই দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কমলাকান্তের কথায় যে বাহ্য-অসঙ্গতি দেখিয়াছি তাহাতে আমরা হাসিয়াছি,

তাঁহার অন্তরের ভাব যেখানে বুঝিয়াছি সেখানে তাঁহার সহিত আমাদের চক্ষুও অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। জগৎকে পরিশুদ্ধ করিয়া তিনি এক আনন্দময় জগৎ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন-দীনবন্ধু প্রভৃতি বৃক্ষের পাতা অথবা শাখার বিকৃতি দেখাইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কোথাও কোথাও কাণ্ডেও আঘাত হানিয়াছেন, 'ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সংক্ষেপ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। ক্রিয়াবাড়ীতে স্যাক্‌রা বসে গেল—ফলারে বামুনেরা এপ্রেনটিস নিতে লাগ্‌লেন—সংস্কৃত কলেজের ফলারের প্রফেসর রকমারী ফলারের লেক্‌চার দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলমনস নোট লিখে ফেল্লেন। এদিকে চতুষ্পাঠীওয়ালা ভট্টাচার্য্যেরা চলিত ও অর্দ্ধপত্র পেতে লাগলেন। অনাহূত চতুষ্পাঠীহীন ভট্টাচার্য্যেরা সুপারিস ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ী, নিমতলা ও কাশী-মিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় যা কটা শকুনি আছে!' আর কমলাকান্ত বৃক্ষের মূল যে স্থান হইতে রস গ্রহণ করিতেছে তাহাকেই আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন। তাই কমলাকান্তকে বুঝিতে কেবলমাত্র বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিলেই চলেনা, হৃদয়েরও প্রয়োজন।

সাহিত্য দর্পনকার বলেন, 'আকার বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি হেতু চিত্তের যে বিকাশ তাহাই হাসের স্থায়িভাব হাস্যরস'। আকার ও বেশের বিকৃতি হেতু যে হাসির সৃষ্টি হয় তাহাকে উচ্চস্তরের কিছুতেই বলা চলে না। সামান্য একজন ভাঁড়ও এরূপে হাসাইতে পারে। বাক্য ও চেষ্টার দুইটা দিক আছে। কৃত্রিম বাক্য প্রয়োগ করিয়া অথবা চেষ্টার দ্বারাও হাসানা যায়—ইহাকেও উচ্চ আসন দেওয়া যায় না। যেখানে হৃদয়ের স্পর্শ আছে কেবলমাত্র সেখানেই উচ্চস্তরের হাস্যরস সৃষ্টি সম্ভব। সেখানে হাসিয়াই কার্য্য শেষ করা যায় না, আকর্ষিত মন কর্ত্তব্যের সন্ধানও পায়।

ভাষার আতসবাজি ছুঁড়িয়া যে হাস্যরস সৃষ্টি করা সম্ভব তাহা বাজির মতই মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলাইয়া যায়। মনকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার শক্তি তাহার নাই। কমলাকান্ত কেবলমাত্র হাসির সৃষ্টি করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই, আমাদের চিন্তার খোরাকও জন্মাইয়াছেন। আমাদের আচারে-ব্যবহারে-স্বভাবে, সামাজিক স্তর বিভাগে যে কত' অন্যায়, কত' সঙ্কীর্ণতার পরিচয় রহিয়াছে তাহা কমলাকান্তের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তিনি তাই আমাদের ভ্রান্তি লইয়া ব্যঙ্গ করেন, তাঁহার

বলনে-ব্যবহারে আমরা হাসিলেও তিনি আমাদের অজ্ঞতা দেখিয়া কান্না রাখিবার ঠাঁই খুঁজিয়া পান না। তাঁহার ব্যঙ্গ শুধুমাত্র ব্যঙ্গই নয়—ভাষার তরবারি খেলিয়া তিনি আমাদের বিস্মিত করিয়া দিতেও চাহেন না। সংশোধন করিবার ইচ্ছা লইয়াই তিনি ব্যঙ্গ করেন, তাই তাঁহার ব্যঙ্গের অন্তরালেও একটা করুণ কান্নার রেশ আমরা শুনিতে পাই। মাতা সন্তানকে শাসন করেন শোধন করিবার উদ্দেশ্যে—কমলাকান্তও সেইরূপ সমাজের জননীস্বরূপ।

এই জগৎকে সুন্দর এবং ভ্রান্তি শূন্য করিতে হইলে কি চাই তাহা তিনি জানেন। তাঁহার ব্যঙ্গের অন্তরালে এক গভীর তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। মানুষের ধর্ম্ম কি তাহা তিনি জানেন,—জানেন যে, মানুষের মুক্তি মানুষেরই মধ্যে থাকিয়া সম্ভব। আনন্দই মানুষের কাম্য—সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে আনন্দ কোনদিন মিলিবে না, 'পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও' (একা)। পরের কাজে লাগিয়াই মানুষ সার্থক হয়, 'কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণ ভোজনে লাগে—তাহাদিগেরই ফলজন্ম ও মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা' (মনুষ্যফল)। সুপক্ক হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বদিক দিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াও যে ফল বা মানুষ মানুষের কাজে না আসিল তাহার জন্মিয়া লাভ কি! মানুষের উপকারে যে ফল লাগে—মানুষের সেবায় যে মানুষ জীবনদান করে কেবলমাত্র সেই সার্থক। পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং অতুল ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াও সে যদি সকলের হইতে পৃথক হইয়া থাকে তবে তাহার সার্থকতা কোথায়? জগতের যে সুন্দর ছবি তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বাস্তবে রূপদানের কি আকাঙ্ক্ষাই না ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে! তাঁহার সমস্ত কথার সার হইতেছে এই যে, মানুষের মধ্যে প্রীতির তরঙ্গ তুলিয়া সমস্ত মানবজাতিকে এক অসীম সমুদ্রে পরিণত করা চাই—'এই বহু জনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোত মধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ওই অনন্ত জনস্রোতমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্বুদ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন? (একা)। সমুদ্রের জলকণাগুলি পৃথকও

ঘটে আমার পৃথক নয়ও ঘটে। মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তাহাও সেই অখণ্ড [illegible]র অঙ্গরূপেই। পৃথক পৃথক মানুষকে অখণ্ড মানবজাতির মধ্যে বিধৃত করিয়া রাখিবে প্রীতি ও প্রেমের বন্ধন। বার বার এই কথাই কমলাকান্ত বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, 'ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য জীবনের সুখ'। (একটি গীত)

কিন্তু সাধারণতঃ কোন্ মানুষ দেখিয়া আমরা অভ্যস্ত? দেখি, একে অন্যের পথরোধ করিয়া নিজে আগাইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। দেখি, অস্বাভাবিক কতক-গুলি প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকেই নিজেকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—খণ্ড, বিচ্ছিন্ন মানব সমাজ। কমলাকান্ত তাই ব্যঙ্গ করিয়া কাহাকেও বলিয়াছেন কাঁটাল, কাহাকেও বলিয়াছেন নারিকেল—কেহবা ধুতুরা, কেহবা তেঁতুল অথবা কুষ্মাণ্ড। মাছি যেমন ভন্ ভন্ করে, একদল মানুষও তেমনি সামান্য রসের জন্য নিকৃষ্ট মাছির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। স্বার্থপর মানুষ আদায় করিবার ইচ্ছায় কেবলই ঘুরিয়া ফিরিতেছে, 'রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নশীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়············যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘরবাড়ী আঁধার করিয়া তোলে···············আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নশীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না' (বসন্তের কোকিল)। স্বার্থ মানুষকে ছোট করিয়া তুলিয়াছে—তাহার স্বভাব ধর্ম্মকে কেবলই বাধা দিতেছে। স্বার্থ মানুষের স্বভাব নহে, উহা স্বভাবের বিকৃতি। স্বভাব যে নহে তাহা জোর করিয়াই বলা চলে এই জন্য যে স্বার্থ আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে কিন্তু আনন্দ হইতে দূরে সরাইয়া লয়। ক্ষীণ প্রাণ যাহার সে সুখকে লইয়া ঘর বাঁধিবার চেষ্টা করে কিন্তু যিনি ভূমাকে জানিয়াছেন তাঁহার কাছে 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি'। সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি সুখের সন্ধান করেন। আত্মা দেহসীমার মধ্যে থাকিয়াও অসীমের সন্ধান রাখে। মানুষের ধর্ম্মই তাই সকলের মধ্যে নিজেকে জানা। স্বার্থ ইহার বাধা, আত্মসর্ব্বস্ব মানুষ তাই মনুষ্য নামের অযোগ্য, সে যন্ত্রমাত্র। বর্ত্তমান যন্ত্রজগৎ মানুষের কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছে, যন্ত্রের জাঁতাকলে তাহার স্নেহ-ভালবাসা

দলিত পিষ্ট হইয়াছে। চারিদিক হইতে যন্ত্ররূপী মানুষ হাত বাড়াইয়া প্রতিনিয়ত বলিতেছে, দাও, আমার দাও—আরও দাও। 'কোথাও জমিদাররূপ ঢেঁকি, প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখরূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া ভানিয়া বাহির করিতেছেন—আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন—দারিদ্র্য, কারাবাস—ধনীর ধনান্ত—ভাল মানুষের প্রাণান্ত। (ঢেঁকি)।

প্রীতির চক্ষে জগৎকে দেখিয়াছেন বলিয়া ধনী দরিদ্রের বৈষম্যজনিত বিষময় ফল তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যুক্তিজাল বা বিজ্ঞানের সহায়তা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। যেখানে যুক্তি তর্কের প্রশ্ন সেখানে মস্তিষ্কই প্রধান—বিভিন্ন মস্তিষ্ক হইতে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি, তাই সেখানে ফাঁক থাকাই সম্ভব। কিন্তু হৃদয়ে ফাঁক থাকে না—তাই সহজেই একটা হৃদয় অপর হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে। হৃদয়বান কমলাকান্ত যখন বলেন, "তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেননা আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই" (বিড়াল)। তখন চোরের প্রতি আমাদের হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া যায়—তাহাকে আর অপরাধী বলিয়াও মনে হয় না। কমলাকান্ত বিপ্লবের কথা বলেন নাই বটে কিন্তু তাহা অপেক্ষাও যাহা অধিক কার্য্যকরী তাহাই করিতে চাহিয়াছেন। বিপ্লবের দ্বারা মনুষ্যযন্ত্রকে হয়ত একদিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায় কিন্তু তাহার সেই দিক্ পরিবর্ত্তন অধিক দিন স্থায়ী না হওয়াই সম্ভব। মানুষের শুভ বুদ্ধিতে তিনি বিশ্বাসবান, মানুষের অন্তরে ভগবান বাস করেন বলিয়াই তিনি মনে করেন—এই সৎবুদ্ধিরূপ ভগবানের কাছেই তাই তিনি বার বার আবেদন করিয়াছেন, সহজ কথায় বুঝাইয়া বলিয়াছেন, "আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—অন্ত নাই" (বুড়া বয়সের কথা)। স্বার্থপরতার বিরুদ্ধেই তাঁহার অভিযান।

কিন্তু তাঁহার অভিযানে ভাঙনের সুর নাই, জগত সংসারকে নবরূপ দানের উদ্দেশ্যেই তাঁহার সমস্ত সঙ্গীত রচিত। "প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি।" (একা)।

মানুষের স্বভাবকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দেখাইয়াছেন যে, পতঙ্গেরই ন্যায় সে কোন এক আলোকে পুড়িয়া মরিবার জন্য ঝাঁপ দিতে সদাই উন্মুখ হইয়া আছে। আলোর চারিপার্শ্বে কাঁচরূপ বাধা আছে বলিয়াই জগত সংসার পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই। বসন্তের কোকিলের কুহুস্বর শুনিয়া কমলাকান্তের মন বিষাদে ভরিয়া যায়, মনে হয় সবই 'কু-উ'—গলাবাজি করিয়া যে যাহা বলিতে পারিবে এ জগতে তাহাই গ্রাহ্য হইবে। "এ জগতে গ্লাডষ্টোন-ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায় তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কাল চলিত না, ··· গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেণ্টে স্থান পাইলেন না কেন?"

কিন্তু কমলাকান্তের অনন্ত আশা। ব্যঙ্গ ত' তিনি কেবলমাত্র ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেই করেন না—আশা ছাড়িলে তাঁহার চলিবে কেন? কালো কোকিলকে ডাকিয়াই তাই তিনি বলিতেছেন, "এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্প-কাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস—আমিও এই সংসার কাননে, গৃহে গৃহে আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই—আনন্দ আছে। তুই পঞ্চম-স্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? ··· যে সুন্দর তাকেই ডাকি, যে ভাল, তাকেই ডাকি।' (বসন্তের কোকিল)

মাতৃমন্ত্রের সাধক কমলাকান্ত। ঘা মারিয়া মারিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। সর্ব্বদিক দিয়া আমাদের উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টাই ছিল তাঁহার জীবনের ধ্যান—আফিঙের নেশা তিনি করিতেন আমাদের নিদ্রার নেশা ছুটাইবার জন্য। যে ভোগ-লালসা এবং আত্মপরায়ণতা

আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে তাহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমাদের সংযমের শক্তি দিতে তাঁহার হৃদয় আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে। স্পষ্ট করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, 'আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।......আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, একদিন মনুষ্য মাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই! এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, একদিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে।' ইহাই কমলাকান্তের দর্শন।

বিভিন্ন উপন্যাসে বঙ্কিম যে নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন কমলাকান্তে বোধ হয় তাহার সবই ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ইহাকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত বলেন, 'কি ভাষার মাধুর্য্যে, কি ভাবের মনোহারিত্বে, কি শুভ্র সংযত সরস রসিকতায়, কি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমে কমলাকান্ত বঙ্গদর্শনের গৌরব। কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজ-শিক্ষক, রাজনৈতিক ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজ শিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই। হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সঙ্গে মর্ম্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সঙ্গে বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার এমন মনোমোহন সমন্বয় কে কবে দেখিয়াছে?'

কমলাকান্তের সৃষ্ট হাস্যরস আজ আর আমাদের শুধুমাত্র হাসির রসদই জোগায় না। হয়ত' প্রথম যুগের পাঠকেরা কমলাকান্তের দপ্তর পড়িয়া হাসিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেন, কিন্তু আজিকার পাঠকের কর্ত্তব্য তাহাতেই শেষ হয় না—এক গভীর চিন্তায় তাঁহারা তলাইয়া যান। সার্কাসের ক্লাউনকে দেখিয়া শিশুর মনে নির্ম্মল হাসির উদয়ই হয়—ক্লাউন যে পাকা খেলোয়াড় সে খবর তাহার জানা নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ যিনি তিনি তাহা জানিয়া ফেলিয়াছেন, এবং জানিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই হাসিতে হাসিতে সেই কৌশলী খেলোয়াড়কে তারিফ না করিয়া তিনি পারেন না। আমরাও আজ বুঝিয়া ফেলিয়াছি যে কমলাকান্ত ভুল করেন নাই, যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য—সমাজ ব্যবস্থার মূল

ধরিয়া তিনি টান দিয়াছেন। যাহা নিয়মের ব্যতিরেক বলিয়া আমরা মনে করিতাম তাহা নিয়মের ভ্রান্তি প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাই কমলা-কান্তের কথায় আমরা আজ হাসিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারি না। আমাদের মন তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লয়—আজ তাই হাসির সহিত চক্ষের জলও ঝরিয়া পড়ে।

দ্বিতীয় ভাগ

BAGHBAZAR READING LIBRARY CALCUTTA

বঙ্কিমচন্দ্র

লেখককে বুঝিতে হইলে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। লেখকের কাল ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী এবং তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। সময়কে অতিক্রম করিয়া তিনি যাইতে পারেন না, আবার সময়ই সব নহে। কেবলমাত্র সময় ও আবেষ্টনীই যদি সব হইত তবে একই কালে বহু বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মিলিত। তাই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হইবে। যদি লেখকের মন বুঝি, সমসাময়িক সমাজ ও মানুষের প্রতি কোন্ দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়াছেন বুঝিতে পারি তবে তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যও আমাদের নিকট অনেকটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

এক যুগ সন্ধিক্ষণে বঙ্কিমের জন্ম। ধর্ম্মক্ষেত্রে একদিকে মিশনারী পাদ্রীরা অপরদিকে রক্ষণশীল হিন্দুর দল এবং উভয়ের মধ্যপথে নূতন আলোক বর্ত্তিকা হস্তে রামমোহন-দেবেন্দ্র-কেশব—আবার ইঁহাদের সকলের ঊর্দ্ধে রামকৃ[illegible]। শিক্ষিত সমাজের একদিকে ডিরোজিও-রিচার্ডসন্ অপরদিকে উত্তরীয়ধারী বিদ্যাসাগর ও ভূদেব। সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্তকবি আর মাইকেল। ভাষার ক্ষেত্রে কাদম্বরী ও আলালের ঘরের দুলাল। বাঙ্গলার আকাশে তখন মেঘ ও বিদ্যুতের সমাবেশ। এই বিশেষ মুহূর্ত্তে আমরা পাই বঙ্কিমকে।

সমাজে তখন ভাঙ্গন ধরিয়া গিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করে। বঙ্কিমও প্রথমে একটু টলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অমিত শক্তিধর বঙ্কিম অচিরে নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিলেন। যুগের নূতন শিক্ষা তিনি গ্রহণ করিলেন কিন্তু ভাসিয়া গেলেন না। পাশ্চাত্য জগতের যাহা ভাল তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন, নিজেদের দেশের যাহা ভাল তাহাকেও বর্জ্জন করিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অবদানের মধ্যে যাহা মানুষের মঙ্গলকারী তাহাকেই তিনি গ্রহণ করিয়া মানুষের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—"তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে যে ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই সে যে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন এদেশীয় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন

তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্ত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।" (বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার ভূমিকা)। কোঁতের দৃষ্টবাদ গ্রহণ করিয়া তিনি প্রীতিকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহার নিরীশ্বরবাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বভূতে প্রীতি কেন? সর্ব্বভূতে অনন্ত ঈশ্বর বিরাজমান বলিয়া। তাই তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ঈশ্বরভক্তিই ধর্ম্মের মূল—"ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব।"

নিজেকে সংযত করিয়া বঙ্কিম দেশের মানুষের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। দেশের ভরসাস্থল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি কি দেখিলেন? "জগদীশ্বর-কৃপায় উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালী নামে এক অদ্ভুত জন্তু জগতে দেখা দিয়াছে, * * * * পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব 'নব্য বাঙ্গালী'-চরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণ পটুতা, গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন—এই সকল একত্র করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল-উজ্জ্বলকারী ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মোক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙ্গালীকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।" পশুবৃত্তির তিল তিল সংগ্রহ পূর্ব্বক 'নব্য বাঙ্গালী' সৃষ্ট হইলেও তাহাকেই গড়িয়া পিটিয়া দেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। এই গড়িয়া পিটিয়া লইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার লেখনী ধারণ। তরবারী ধারণ সম্ভব হইলে নিশ্চয়ই তাহাও তিনি করিতেন। জমি প্রস্তুত না হইলে কোন কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃত মানুষ সৃষ্টি হইলে তবেই সর্ব্বদিকে সে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবে। নরম জমিতে তাজমহল সৃষ্টির চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। এই জন্য শক্ত মাটী প্রস্তুত করিবার কাজে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।"

নিজেকে সম্মানের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি ব্যাকুল হন নাই, তিনি চাহিয়াছেন মানুষকে গড়িয়া তুলিতে। সেই যুগে যখন চারিদিকে

শৈথিল্য তখন মানুষকে একসূত্রে গাঁথিয়া এক অখণ্ড মানবজাতি সৃষ্টির জন্য তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা মানুষের স্বভাবের বিকৃতি—ইহাদের সাহায্যে মানুষ কোনদিন আনন্দ লাভ করিতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কের মধ্য দিয়াই এই আনন্দলাভ সম্ভব। তাই তিনি বলিয়াছেন, "প্রীতিই ঈশ্বর" এবং "ঈশ্বরই প্রীতি"। সমগ্র মানব জাতির মিলন কোথায় হইতে পারে? মানুষেরই সৃষ্ট সমাজের মধ্যে। এই সমাজ বিশাল সমুদ্র আর প্রতিটি মানুষ বারিবিন্দু মাত্র—"এই বহুজনাকীর্ণ নগরী মধ্যে, এই আনন্দময় অনন্ত জনস্রোতমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ওই অনন্ত জনস্রোত মধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্‌বুদ্ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ্ না হই! বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র,—আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?" (একা)।

সমাজের নিকট হইতে আদায় করিবার চেষ্টায় মানুষ সমাজকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছে এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আনন্দও হারাইয়াছে। সমাজের মঙ্গল সাধন করিব, সমাজকে দিব এই আদর্শ যদি হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারি তবে সমাজের ভিতর দিয়া সকলকে দিয়া নিজেও পাইব। সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যেই সকলে এই বোধ-ই ত' আনন্দের মূল। বঙ্কিম এই কথাটা মানুষের অন্তরে গ্রথিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন; তাঁহার কমলাকান্তে, ধর্ম্মতত্ত্বে, প্রবন্ধে, উপন্যাসে এই কথাটা বারবার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। "পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও" (একা)। সমস্ত মানুষের কেন্দ্রস্থলে সমাজকে বসাইয়া তাই তিনি পরিষ্কার কণ্ঠে বলিয়াছেন, "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে।" এই কারণে যাহা কিছু সমাজবিরোধী তাহাকেই তিনি আঘাত করিয়াছেন। ব্যষ্টির প্রয়োজনে সমাজকে পরিবর্ত্তন করিবার কথা তিনি মনেও আনেন নাই, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্যক্তির সুখকে স্বীকার করিয়া লইলে কোন কেন্দ্রস্থলে তাহাদের আর মিলিত করা সম্ভব হইবে না। তাই সমাজের যূপকাষ্ঠে তিনি ব্যষ্টির সুখকে বলি দিয়াছেন।

বঙ্কিম জানিতেন যে ঔপন্যাসিককে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতে হইবে। ঈশ্বরের মত তিনি জগতের সর্ব্বত্র থাকিয়াও ধরা-ছোঁয়ার বাহিরেই রহিয়া যাইবেন। তাঁহারই মত শিল্প জগতের চারিদিকে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া মানুষকে সুন্দরের পূজারী করিয়া সুন্দর করিবেন। তথাপি তিনি নিজেকে গোপন করিতে পারেন নাই। জাতিকে গঠন করিবার একান্ত আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রতি উপন্যাসেই বেত্র হস্তে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। যদিও তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন," তথাপি কাব্য সৃষ্টির সেই উদ্দেশ্য তিনি পালন করিতে পারেন নাই। বারবার তিনি উপন্যাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া পাপীর দণ্ডবিধান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের মত অতি সচেতন সাহিত্যিককে কেন এইরূপ করিতে হইয়াছে? ইহা সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া বলিয়াই মনে হয়। পাপীর দণ্ডবিধানের জন্য তিনি সময় নষ্ট করিতে চাহেন নাই—পাপ সংঘটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাপীকে আক্রমণ করিয়াছেন, স্বাভাবিক ভাবে তাহাকে অগ্রসর হইয়া দণ্ডগ্রহণের সুযোগ দিবার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা পর্য্যন্ত তিনি করিতে পারেন নাই। ইহাতে নীতি হয়ত' রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু বারবার কাব্যের পদস্খলন ঘটিয়া তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। কবি হইয়াও সমাজকল্যাণের মুখ চাহিয়া তিনি কাব্যকলাকে এমনি করিয়া বহুবার উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন, "কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি"। কবির মধ্যে রহিয়াছে সৃষ্টির প্রেরণা—বিশ্বের যে অখণ্ড সুন্দর রূপ ধরা পড়িয়া যায় তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাকে তিনি প্রকাশ না করিয়া পারেন না। সুন্দর প্রকাশিত হইয়া আপন শক্তিতেই মানুষের চিত্ত জয় করে। এই সুন্দর যতক্ষণ হৃদয় উদ্ভাসিত করে ততক্ষণই কবি দ্রষ্টা, যে মুহূর্ত্তে তিনি কোন উদ্দেশ্য সফল করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন সেই মুহূর্ত্তে তিনি দ্রষ্টার দৃষ্টি হারাইয়া ফেলেন। তখন আর তিনি সকলের থাকেন না, তখন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার নিজেরই। সে সময়ে আর তিনি কবি নহেন, তথ্য বা তত্ত্ব বেত্তা। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে দ্রষ্টার সৃষ্টিতে

কি কোন উদ্দেশ্য থাকে না? থাকে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। জগৎ বিষয়ে তাঁহার যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তাহা সৃষ্ট সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিয়া গিয়া আমাদের মনে সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়াই রেখাপাত করে। অপরদিকে তত্ত্ব বা তথ্যবেত্তা নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত হইয়া সৌন্দর্য্যকেই আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া কাব্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসেন। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে বঙ্কিম বহুবার এইরূপ কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

জাতিগঠন করিবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় বঙ্কিম তাই নীতিবিদ্‌রূপে তাঁহার উপন্যাসে বার বার আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবিরূপে কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া সমসাময়িক মানুষকে সুন্দর করিবার ভরসা তিনি করিতে পারেন নাই। কবি, তরজা, হাফ-আখ্‌ড়াই এবং অপরদিকে মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংসে রুচি সম্পন্ন মানুষকে দেখিয়া এই ভরসা করা বড় সম্ভবও নহে। চারিদিকের শৈথিল্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সমাজকে পুনরায় গঠন করিবার প্রচেষ্টায় তিনি বেত্র হস্তে কেবলই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কাব্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও নিজেকে সংযত করিতে পারেন নাই। তাই আমরা দেখি বঙ্কিম কখনও নীতিবিদ্, কখনও কবি। কবি বঙ্কিমের যখন প্রকাশ হইয়াছে তখন তাঁহার নীতি দূরে থাকিয়া অপেক্ষা করিয়াছে আবার নীতিবিদ্ যখন বেত্র হস্তে সম্মুখে আসিয়াছেন তখন কবির মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার সেই পরিবর্ত্তনের যুগে যুগ-প্রবর্ত্তক বঙ্কিমের পক্ষে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যই যে প্রধান হইয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি! তথাপি তাঁহার কবিচিত্ত বার বার নীতিকে আঘাত করিয়াছে এবং তাহারই ফলে সেই নীতির মধ্যেও একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। কবি বঙ্কিমের সেইখানেই জয়, তাঁহার উপন্যাসে বৈচিত্র্যের মূলেও এই পরিবর্ত্তনের হাত অনেকখানি।

প্রথম যুগে তিনি নিয়তির অমোঘ শক্তিতে আস্থাবান। ললাটলিপি স্থির হইয়াই আছে, তুমি যত বড় শক্তিমানই হও না কেন তোমার কোন কিছু করিবার উপায় নাই—নিয়তির বোনা জালের গিট্ খুলিয়া বাহিরে এতটুকু মুখ বাড়াইবার পথও তুমি পাইবে না। কাপালিকের হাত হইতে পলাইয়া মঠাধ্যক্ষের প্রচেষ্টায় নবকুমার-কপালকুণ্ডলার বিবাহ হইলেও মিলন হইল কি? দেবতা ফুল গ্রহণ করিলেন না—নিয়তি এ বিবাহের পরিণতির ইঙ্গিত করিয়া গেল। কপালকুণ্ডলার

মধ্যে মানুষের বৃত্তির যেটুকু চিহ্নও দেখিয়াছি মৃন্ময়ীতে তাহাও আর দেখিলাম না। নবকুমারের ভালবাসাও যুবতীর মনে কোন রেখাপাত করিতে পারিল না—মৃন্ময়ী সত্য সত্যই মাটীর প্রতিমা হইয়াই রহিল। পরিশেষে তাহার মৃত্যু—সব কথা শুনিয়া নবকুমার যে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে, তাই পাড় ধ্বসিয়া পড়িল, মাটীর প্রতিমা জলের মধ্যে বিসর্জ্জিত হইল। এ মৃত্যুতে তাহার নিজের কোন অপরাধ নাই, নবকুমারও তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী নহে—নিয়তি স্বপ্নের ভিতর দিয়া কাপালিককে যে আদেশ দিয়াছেন তাহা পালন না করিয়া নবকুমারের ঘর আলো করিয়া থাকিবার তাহার সাধ্য কি?

প্রথম যুগের শেষ উপন্যাস বিষবৃক্ষে পরিবর্ত্তনের আভাস দেখা যায়। কুন্দের স্বপ্নে সাবধান বাণী উচ্চারিত হইল তথাপি সে সরিয়া যাইতে পারিল না, তাহার অন্তরে যে প্রণয়ের বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহাই তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া লইয়া গেল মৃত্যুর দ্বারে। বিপদ হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে জানিয়াও কুন্দ সেই পথেই পা বাড়াইয়া দিল। এখানে নিয়তি গৌণ, মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে কুন্দের প্রবৃত্তি—তাহার মনের গোপন মণিকোঠায় যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল তাহা তাহাকে অসংযত করে নাই বটে কিন্তু অপরের অসংযম এবং হীরা দাসীর প্রতিহিংসা বৃত্তি তাহার মৃত্যু ঘটাইল। নিয়তি যাহাদের নিকট হইতে তাহাকে দূরে থাকিতে বলিয়াছিল তাহারাই তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী। স্বপ্নদর্শনের ব্যাপার-টুকু না থাকিলে এই উপন্যাসে নিয়তির হস্তক্ষেপ আমরা বাতিল করিয়া দিতে পারিতাম। বঙ্কিম নিয়তিকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়াই তাহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় যুগে চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপকে কেন্দ্র করিয়া নিয়তি কোন খেলাই খেলে নাই—অপ্রধান চরিত্র দলনী বেগমই সেখানে তাহার লক্ষ্য। এখানেও নিয়তি তাহার খেলা খেলিয়াছে অনেকের ভ্রান্তির ছিদ্র পথ ধরিয়া। নবাবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় দলনী গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিল—গুরগণের কৌশলে সে আর প্রাসাদে ফিরিতে পারিল না। তারপর ইংরাজের ভ্রম, তকী খাঁর শয়তানী এবং নবাবের ভ্রম—পরিণতি, দলনীর মৃত্যু। কোথাও অস্বাভাবিকতা নাই, শিল্পকলার দিক দিয়াও এই পরিণতিই ঠিক কুন্দের মৃত্যুর মতই অপরিহার্য্য।

কুন্দ স্বপ্নের মধ্যে নিজের ভাগ্যলিপি পাঠ করিয়াছিল—মীরকাসেমও দলনীর ভাগ্যলিপি গণিয়া দেখিয়াছিলেন। তবে উভয়ের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য দেখিতে পাই আমরা বঙ্কিমের মনে। বিষবৃক্ষে নিয়তির শক্তিতে বঙ্কিমের বিশ্বাস ছিল—চন্দ্রশেখরে আসিয়া তাহা শিথিল হইয়া গিয়াছে। মীরকাসেম দলনীর ভাগ্যলিপি গণিয়া দেখিলেন, কিন্তু গণনাকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—ডাকিয়া পাঠাইলেন চন্দ্রশেখরকে। চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'আমি গণিতে পারিলাম না' * * * * 'সকল কথা গণনায় স্থির হয় না'। এই কথা বলিবার জন্য 'ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিবার' প্রয়োজন হয় না। তাই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে চন্দ্রশেখর গণিতে ঠিকই পারিয়াছিলেন—পারেন নাই কেবল নিজের মনকে সুস্থির করিতে। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না। গণনার ফলাফল বলিয়া নবাবকে অসুখী না করিবার উদ্দেশ্যেই কি তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন? সেই শাস্ত্রজ্ঞ, তেজস্বী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না বলিয়াই মনে হয় তাঁহার মনেও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। নবাবের প্রিয়তমা পত্নীর নবাবেরই আদেশে বিষপানে মৃত্যু কি করিয়া সম্ভব! মানুষের ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কি কিছুই নয়? চন্দ্রশেখরের মনের মধ্যে ধূমায়িত এই সন্দেহের কথা আমরা অন্যত্র তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।" যদি ভবিতব্যকে খণ্ডন করা অসম্ভবই হয় তবে পুরুষকারের মূল্য কি? চেষ্টারই বা অর্থ কি? বঙ্কিমের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছিল। ভবিতব্য ও পুরুষকারের দোটানায় পড়িয়া তিনি কোন সমাধানে পৌঁছাইতে পারেন নাই। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মে আশ্রয় লইয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত সমস্যার কণ্ঠরোধ করিতে চাহিয়াছেন। তাই চন্দ্রশেখরে, আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরাণীতে বার বার তিনি নিষ্কাম কর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উপন্যাসের সমস্ত চরিত্রই যদি নিষ্কাম কর্ম্মে রত হয় তবে উপন্যাসই বা দানা বাঁধিবে কি প্রকারে, আমাদের সাংসারিক মন-ই বা দাঁড়াইবে কোথায়?

ব্যক্তির দাঁড়াইবার স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া বঙ্কিম তাহাকে সমাজের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি সমাজের উপর তাঁহার কতখানি

শ্রদ্ধা ছিল। নিষ্কাম কর্ম্মে রত মানুষ সমাজ সেবার ভিতর দিয়া নিজেও তাহার প্রাপ্য পাইয়া থাকে। নিয়তির অমোঘ বিধান অথবা নিষ্কাম কর্ম্ম ইহাদের কোনটাই মানুষকে একসূত্রে গাঁথিতে পারে না। নিয়তির বিধানেই যদি আমাকে পাক খাইয়া ফিরিতে হয় তবে আমার অস্তিত্ব কোথায়—আমার বাঁচিয়াই বা সুখ কি? নিষ্কাম কর্ম্মেই বা কয়জন রত থাকিতে পারে? একমাত্র হৃদয়কে অবলম্বন করিয়াই মানুষ স্নেহ-প্রীতিতে অভিষিক্ত হইতে পারে। নানা প্রবন্ধে এই কথা বলিয়াও বঙ্কিম মানুষের হৃদয়কে সহজ পথে অগ্রসর হইতে দিবার ভরসা করেন নাই। তিনি মনে করিতেন হৃদয়কে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে সে আর কোন বন্ধনই স্বীকার করিবে না। বিশেষ করিয়া নারীর হৃদয়কে তিনি এতটুকু বিশ্বাস করিতেন না—"জল চঞ্চল, এই ভুবনচাঞ্চল্য বিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?" (চন্দ্রশেখর)। বাঁধন ছাড়া হৃদয় আত্মসুখের জন্য সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে মনে করিয়াই তিনি হৃদয়কে মুক্তি না দিয়া জোর করিয়া সমাজের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই যে জোর করিয়া বাহিরের বাঁধন শক্ত করিতে গেলে মনের বাঁধন আল্‌গা হইয়া যায়। সমাজ যখন সমস্ত মানুষকে একই চক্ষে দেখে তখনই সমাজের মঙ্গল সাধনের জন্য মানুষ আত্মবলি দিতে পারে। কিন্তু সমাজ যখন কোন গোষ্ঠীর হাতের অস্ত্র হইয়া ওঠে তখন আর সেই গোষ্ঠীর বাহিরের লোকেরা তাহাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে না। সমাজ যখন মানুষেরই তখন মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আনিতে হয়, অন্যথায় সমাজের মৃত্যু ঘটে। মৃত সমাজের জন্য কে প্রাণবলি দিবে? তাই হৃদয়কে ছাড়িয়া দেওয়াই বোধ হয় সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল। ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলা দেখা দিবার সম্ভাবনা যে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে সাময়িক। সহজ সুন্দর বোধ হইতে মানুষ আপন গরজেই নিজেকে সংযত করিয়া লয়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্য-বোধে বলিয়াছেন, "এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই। যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয়; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়। যে-দেশ আমার নিকট ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটা

নামমাত্র সে-দেশের লোক সে-দেশের জন্ত প্রাণ দেয়। তাহারা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্ত প্রাণ দিতে পারে। ....তবেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই।" সমাজকে আমার বলিয়া বুঝিলেই তাহার জন্ত প্রাণ বলি দিতে পারিব। কলুর বলদের মত মানুষকে সমাজের ঘানিতে জুড়িয়া দিলে মানুষও হয়ত' সেই বলদের মতই একদিন বাঁধন ছিঁড়িবার কথা ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহার ফলে মিলিবে মৃত সমাজ ও মনুষ্যত্ব-হীন মানুষ। সমাজ গতিশীল হইলেই গতিশীল হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারিবে। বড় প্রেম কখনও বাঁধিয়া রাখে না এবং বাঁধিয়া রাখে না বলিয়াই বোধ হয় হারাইবার ভয়ও তাহার নাই—

"তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারই এমন ধারা
বাঁধো নাকো, লুকিয়ে থাকো
ছেড়েই রাখো দাসে।" (গীতাঞ্জলি)

সমসাময়িক মানুষের মধ্যে শৈথিল্য দেখিয়া বঙ্কিম হৃদয়কে ছাড়িয়া দিবার ভরসা করেন নাই—সমাজের খুঁটায় তাহাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে মনে তাঁহার অনেক প্রশ্ন উঠিলেও তিনি পুরাতন জড় সমাজকেই মানুষের মিলনের কেন্দ্রস্থল রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিলেন। তাই তাঁহার নীতি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করিয়াছে। যে হৃদয় শৃঙ্খলা না ভাঙ্গিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে চাহিয়াছে তাহার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। প্রতাপ শৈবলিনীকে ভালবাসিয়াছে সত্য কিন্তু মুহূর্তের জন্যও সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা করে নাই, তাই প্রতাপকে মহান বলিতে তাঁহার কোথাও বাধে নাই—"এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে" (চন্দ্রশেখর)। ব্যক্তিগত সুখকে বঙ্কিম স্বীকার করেন নাই—"আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্ত আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্ত কোন মূল নাই" (আমার মন—কমলাকান্ত)। তাই সমাজ এত' বড় হইয়া দেখা দিয়াছে বঙ্কিম সাহিত্যে। তাই বঙ্কিম কবি হইতে

নিয়াও শ্রীভিনিদ্ বইতে উঠিয়াছেন—তাঁহার স্বষ্ট চরিত্রগুলি এই উদ্দেশ্যের প্রকাশে অঞ্জলি দিয়াছে। “এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নলরাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহাপুরুষগণ চির-দুঃখী—কদাচিৎ সুখী। …………যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। ……তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কেন না, তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই, ইহাই সিদ্ধ।” সিদ্ধ হউক আর না-ই হউক এই কথার পর বঙ্কিমকে বুঝিতে কষ্ট হয় না। চন্দ্রশেখরকে সান্ত্বনা দিতে সুখ-দুঃখ তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া রমানন্দের মুখ দিয়া বঙ্কিম পর-মুহূর্ত্তেই যাহা বলিলেন তাহাতে বঙ্কিমের মনের কেন্দ্রগত ভাব একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল—“আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অনন্ত নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখ নিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখের নিবারণ হয়। দেবগণ জীব দুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদি বিকার শূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই। পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্ত্তন করিয়া ভীষ্মাদি দেবগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে।” পরোপকার রূপ সূত্র দ্বারাই বঙ্কিম ব্যক্তি ও সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইয়া যে সত্যকার সুখ লাভ হয় না সে কথা মহাভারতকারও বলিয়া গিয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, “কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়! এত' দুঃখ, এত' যুদ্ধ, এত' রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই * * * *। কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে; কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে।” বোয়ারের গ্রেট হাঙ্গারেও দেখি আকাঙ্ক্ষা মিটিলেও তৃপ্তি নাই—আকাঙ্ক্ষা কেবল বাড়িয়াই যায়। শান্তি মেলে পরোপকার করিয়া। কিন্তু এই পরোপকারের মধ্যেও যে রহিয়াছে হৃদয়ের কথা। এখানে পরোপকার

নিছক তত্ত্ব বিলাইবার দেখা দেয় নাই। সম্পূর্ণ বিকশিত হৃদয় মুক্তি পাইলে খোলা খুসীতে ভর করিয়া যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায় না—বিশ্বের সমস্ত হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্যই তাহা উন্মুখ হইয়া ওঠে। বঙ্কিম নিজেও একথা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কমলাকান্তের মুখে শুনিতে পাই, "ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল—এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল—সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য জীবনের সুখ" (একটি গীত)। কিন্তু বুঝিয়াও তিনি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাই তিনি ভ্রান্ত পথে চলিয়া হৃদয়কে বিকশিত করিতে চারিদিকে শক্ত বাঁধন আঁটিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পরোপকার সেই কারণেই তত্ত্ব হইয়া উঠিয়া উপন্যাসগুলিকে নীরস করিয়া দিয়াছে। এইখানেই দেখা মেলে নীতিবিদ্ বঙ্কিমের। কিন্তু কবি বঙ্কিম যখন নীতিবিদ্‌কে সরাইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন পরোপকার সরস প্রাণবন্ত হইয়াছে। রমানন্দ শিষ্যের মঙ্গলের জন্য শৈবলিনীকে রোগমুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—প্রতাপ 'শৈ'কে ভালবাসিয়া তাহার সুখের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছায় আত্মবলি দিয়াছে। তাই রমানন্দের পরোপকার অপেক্ষা প্রতাপের পরোপকার শ্রেষ্ঠ। নীতিবিদ অপেক্ষা কবি শ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম সেকথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার প্রতাপ পরস্ত্রীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছে জানিয়াও রমানন্দ স্বামী বলিয়াছেন, "যদি চিত্ত সংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে সমাজকে রক্ষা করিয়াই চলিয়াছেন। সংস্কারের ইঙ্গিত অনেক স্থলে থাকিলেও স্পষ্ট করিয়া সমাজের অন্যায়কে তিনি কোথাও দেখান নাই। সুন্দরীকে শৈবলিনী প্রশ্ন করিয়াছিল, "যদি কখন আমার পুত্র সন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখন কন্যা হয় তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে?" সুন্দরী উত্তরে অদৃষ্টের দোহাই পাড়িল। ব্যক্তি ও সমাজ যে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত সেকথা বঙ্কিম যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। ব্যক্তির প্রয়োজনে সমাজকে নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়োজনও ত' আছে। সেকথা বঙ্কিম কোথাও

স্বীকার করেন নাই। সমাজের নিপেষণে ব্যক্তির যে দুঃখ সে তাহার অদৃষ্ট, কিন্তু ব্যক্তির বিরুদ্ধতায় সমাজে যদি এতটুকু চাঞ্চল্যও হয় তবে তাহার ব্যবস্থা প্রায়শ্চিত্ত—সে সমাজের অদৃষ্ট নহে। আবার তুমি যদি নারী হও ত' তোমার দণ্ড কঠিন—কুন্দ-রোহিণীর মত তোমায় মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। বালিকা কুন্দ যদি ভালবাসিয়া অপরাধ করিয়া থাকে তবে পরিণতবয়স্ক বুদ্ধিমান নগেন্দ্রনাথের অপরাধের সীমা কোথায়? নিষ্পাপ পতিগত প্রাণা দলনীর মৃত্যুর জন্য মীরকাসেমের দণ্ড কি? অনুতাপানল! দলনী নারী, তাহার পক্ষে পাপীয়সী হওয়াই যে স্বাভাবিক! সুতরাং তাহার সম্বন্ধে যদি কোন ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে ত' তাহা ক্ষমা করা চলে। বিদ্যার্জনের সুবিধার জন্য শৈবলিনীকে গৃহে আনিয়া সমাজ-বন্ধনের মূল দাম্পত্য জীবনের প্রেম-প্রীতির কথা ভুলিয়া গেলেও চন্দ্রশেখর পণ্ডিত বলিয়াই শ্রদ্ধেয় হইবেন আর হৃদয় অন্বেষণ কারিণী শৈবলিনীকে পাপিষ্ঠা বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। এই খানেই পক্ষপাতী নীতিবিদ্ বঙ্কিমের প্রকাশ।

কিন্তু কবি কি সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছেন? নীতির কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে কবিকে মাথা নত করিয়া থাকিতে হইয়াছে সত্য কিন্তু আভাসে ইঙ্গিতে বার বার তাঁহাকে আমরা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। প্রেমকে তিনি ছোট করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন যে প্রেমের পাত্রাপাত্র নাই। প্রেমের বীজ উপ্ত হইলে তাহাকে সযত্নে হৃদয়ে স্থান দিতে হয়। যত্ন না পাইলে সে বীজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে কি প্রকারে? বৃদ্ধি না পাইলে সামান্য ক্ষেত্র লইয়া উহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ভাবেই কোন মতে টিকিয়া থাকিবে। ইহারই ফল স্বার্থ, দ্বন্দ্ব। যত্ন পাইলেই সেই বীজ হইতে মহীরুহ সৃষ্টি হইতে পারিবে—বহুদূর ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইবে তাহার শাখা-প্রশাখা, পথিকেরা বিশ্রাম পাইবে সেই তরুতলে, পক্ষীর দল আশ্রয় পাইবে—ইহাই ত' হৃদয়ের বিভূতি। তাই মৃণালিনীতে মনোরমার মুখে শুনিতে পাই, "তুমি পুরাণ শুনিয়াছ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ সহিত শুনিয়াছি। লেখা আছে, ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন; এক দাম্ভিক মত্তহস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ; ইহা জগদীশ্বরপাদপদ্ম-নিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়জটাবিহারিণী; যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে"......। দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ, সে

প্রণয়বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়; প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে ন্যস্ত রয়—পরিশেষে সাগর সঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্ব্বজীবে বিলীন হয়।" 'প্রীতিই ঈশ্বর' এবং 'ঈশ্বরই প্রীতি' মন্ত্রের উপাসক এই কারণেই প্রেমকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। যে প্রেম ইন্দ্রিয় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে তাহাকে তিনি প্রেম বলিয়া স্বীকার করেন নাই—সে ভোগলালসা মাত্র। প্রকৃত প্রেম প্রিয়পাত্রকে অবলম্বন করিয়া ভাগীরথীর ন্যায়ই একদিন সাগরের দিকে ছুটিয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বহৃদয় স্পর্শ করে। তাই যে প্রেমিক ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে, যে প্রেম সমাজকে আঘাত করে না তাহার জয়গান না করিয়া তিনি পারেন নাই। সেই জন্যই প্রতাপের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ—পরস্ত্রীকে 'শৈ' বলিয়াও সে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে। ইন্দ্রিয়জয়ী এই ব্যক্তিটীর বিরুদ্ধে নীতিবিদের কোন অভিযোগ নাই বলিয়াই কবি নির্ভয়ে তাহাকে দেবতার উর্দ্ধে আসন দিতে পারিয়াছেন। কুন্দ-রোহিণীর প্রতি দণ্ডবিধানের তারতম্যে কবিরই প্রকাশ। কুন্দ সরলা, সে নগেন্দ্রনাথকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল সত্য কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন দিন তাহা বলিতে পারে নাই—নিয়তির ইঙ্গিতে সূর্য্যমুখী তাহাকে নগেন্দ্রের সহিত মিলিত করিল। বিধবার বিবাহ এবং সূর্য্যমুখীর সুখের সংসারে অগ্নিসংযোগ নীতিবিদ্ সহ্য করিতে পারেন না—তাই কুন্দের দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবেই। কিন্তু কবি তাহারই মধ্যে একটু সরস পরশ দিয়া গেলেন, কুন্দ আত্মহত্যা করিল—সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগের পর যে স্বামীকে সে হারাইয়াছিল সেই অন্তিম সময়ে তাহার হৃদয়ের স্পর্শও পাইল। সৌভাগ্যবতী রমণীর ন্যায় স্বামীর "চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন-যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল"—তাহার শেষ যাত্রাপথ নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখী-কমলমণির অশ্রুতে অভিষিক্ত হইল। কিন্তু রোহিণীর দণ্ড কঠোর, তাহার মধ্যে সারল্য নাই, সে ইন্দ্রিয়পরায়ণা এবং ভোগে উন্মত্ত থাকিতে চায় তাই তাহাকে প্রাণ দিতে হইল গোবিন্দলালের হাতেই—কেহ তাহার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না। শৈবলিনীর অদৃষ্ট অন্যরূপ। পরপুরুষকে ভালবাসার জন্য তাহাকে কঠোর শাস্তি পাইতে হইল, সে উন্মাদিনী হইয়া গেল। চন্দ্রশেখরের সংসারকে (?) সে ধ্বংস করিতে পারে নাই, ইন্দ্রিয়জয়ী প্রতাপও সমস্ত গরল কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিল তাই প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই শৈবলিনী নিষ্কৃতি পাইল। চন্দ্রশেখরকে নীতিবিদ্ অসুখী করিবেন কি করিয়া? তাই শৈবলিনীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইল মনস্তাত্ত্বিক ও

যোগবলের মিশ্রিত বিধানের ফলে। শৈবলিনী নিষ্কৃতি পাইল কিন্তু কবি অত সহজে নিষ্কৃতি পাইলেন না। নীতিবিদ্ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, সীতার মত সতী অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও লোক নিন্দার জন্য বেশীদিন শ্রীরামচন্দ্রের ঘর করিতে পারেন নাই—তোমার শৈবলিনী পাপিষ্ঠা, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছ কিছু বলিব না কিন্তু লোক নিন্দাকে পাশ কাটাইয়া তাহাকে সমাজে প্রবেশ করাইতে পারিবে না। সতীত্বের প্রমাণ না দিয়া সে চন্দ্রশেখরের ঘর করিবে কোন্ অধিকারে? সত্যই ত', কবি পথ পাইলেন না। কিন্তু নীতিবিদ্ও নিজের মানস পুত্র চন্দ্রশেখরের দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে সুখী না করিয়া তিনি পারেন না। শৈবলিনী ব্যতীত চন্দ্রশেখরেরও সুখ নাই, সর্ব্বোপরি রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীকে রোগমুক্ত করিয়া তাহাকে চন্দ্রশেখরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং সতীত্বের প্রমাণ দিতে নীতিবিদ্ নিতান্ত দয়া করিয়া যুদ্ধের ঘনঘটার মধ্যেও কুল্সম, ফষ্টর, তকি খাঁকে একত্র করিলেন—অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কবিকে বলিলেন, এইবার নাও তোমার শৈবলিনীকে, কিন্তু 'শৈ'-এর যেন মৃত্যু হয়। 'যুদ্ধক্ষেত্রে' প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর উক্তি শুনিয়া কবি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। "যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।" চিন্তিত হইবারই কথা, কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা কি হৃদয়কে মুছিয়া দেওয়া যায়! 'শৈ'-এর মৃত্যু শৈবলিনীর অন্তরে হইবে এমন ভরসা কোথায়? তাই তাহার বাহিরের অবলম্বনকে সরাইয়া দিতে হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া প্রতাপ 'শৈ'-এর মৃত্যু ঘটাইল এবং কবিকেও বাঁচাইয়া গেল। অশ্রুসজল চক্ষে ভয়ে ভয়ে নীতিবিদ্-এর দিকে চাহিয়া কবি বলিলেন, "তবে যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও।"

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে নীতিবিদ্ ও কবির সামঞ্জস্য হয় নাই। তাই তাঁহার উপন্যাসে পরস্পর বিরোধী দুইটী ধারা রস প্রবাহ ব্যাহত করিয়াছে। তথাপি তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এক গম্ভীর অথচ সুন্দর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি কাহিনী পরিকল্পনায়, কি চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁহার সমকক্ষ খুব কম দেশেই পাওয়া যায়। বিভূতি চৌধুরীর কথায় বলিতে পারি, "শুদ্ধ উপন্যাস-সাহিত্যে ও সমালোচনায়

তিনি যে অপূর্ব্ব সৃজনী-ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রতিষ্ঠা দান করিবে। ইতিহাসের বিস্মৃতিময় তামস-লোকে কবি-কল্পনার যে বর্ণাঢ্য আলোক-সম্পাত তিনি করিয়াছেন, নর-নারীর হৃদয়-রহস্য উদ্ঘাটনে যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, চরিত্র সৃষ্টিতে যে বহুমুখিতা দেখাইয়াছেন এবং সংঘাতমুখর মানব-জীবনে যে সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের তুল্য অলৌকিক প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। * * * * * কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপের মধ্যে আমরা ইহা দেখিতে পাই। নীতিবিদ্ বলিবেন, পরস্ত্রীকে ভালবাসা অন্যায় সুতরাং শৈবলিনীর প্রতি প্রতাপের আকর্ষণ নীতিবিগর্হিত। সাহিত্যিক কি বলিবেন? অসংযমে অসুন্দরেরই প্রকাশ—সংযমই সুন্দর। সুতরাং প্রতাপের সংযম সুন্দর বলিয়াই সাহিত্যে প্রকাশের যোগ্য। রবীন্দ্রনাথও এই দিক দিয়াই সাহিত্যকে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, "মঙ্গল আমাদের ভালো করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভালো বলি, ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না। যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাহা সুন্দর। অর্থাৎ, প্রয়োজন সাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি উপদেশ দিয়া মঙ্গল প্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং করিয়া মঙ্গলকে তাহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন" (সাহিত্য)। শিব ও সুন্দরের মধ্যে তিনি একটা মিল আবিষ্কার করিয়াছেন—"লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন, এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই সুন্দর ছন্দেই সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া যে একথা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর। কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। * * * * সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণ স্বরূপ।" সুতরাং সাহিত্যকে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ একই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

বঙ্কিম সমাজের মধ্যে মানুষকে ডুবাইয়া দিয়াছেন—সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির আত্মবলির ব্যবস্থা দিয়াছেন। "আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে, স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।" সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যষ্টির আত্মবলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য' লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই মঙ্গল এবং সুন্দর বলিয়া মনে করিয়াছেন। বাঙ্গলার এই দুই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের মানস দৃষ্টিভঙ্গী একই প্রকার বলিয়াই প্রতাপের মুখে যেমন শুনি, 'আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা', বিনোদিনীর মুখেও তেমনি শুনিতে পাই, 'আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না'। বিধবা বিনোদিনীর পক্ষে এই ত্যাগ 'জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা' অপেক্ষা কম কিসে? গ্রহণ অপেক্ষা ত্যাগের মূল্য অনেক বেশী, চারিদিকে মানুষ হাত পাতিয়াই বসিয়া আছে, সেই সঙ্গে দিকে দিকে রব উঠিয়াছে, দাও, আরও দাও। এই হাত পাতাকে বলি ভিক্ষাবৃত্তি। ভিখারীকে আর যাহাই করি শ্রদ্ধা করিতে পারি না। যে বুনো রামনাথের কোন বিষয়ে 'অনুপপত্তি' ছিল না তাঁহারই পদতলে রাজার মুকুটও শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে। পারিষদ বেষ্টিত সিংহাসনারূঢ় রাজা রামের মূর্ত্তি অপেক্ষা পিতার আজ্ঞায় জটাবল্কধারী শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব্ব বৈরাগ্য মণ্ডিত মূর্ত্তি আমাদের ভাবরাজ্যে মহা অলোড়ন তুলিয়া দেয়। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত—উভয়েই একইরূপে ভারতের অন্তরাত্মাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। 'ঘরে বাইরে'র মাষ্টার মহাশয়ের মুখে তাই শুনি, "আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা,—কিন্তু, আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।" ত্যাগের ভিতর দিয়াই মানুষ নিজের শক্তি উপলব্ধি করিতে পারে। নিজের শক্তি উপলব্ধিই নিজেকে জানা—এই জানাই ত' আনন্দ! আনন্দের পর আর কোন কথা নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রও বলিয়াছে, "সুখার্থী সংযতো ভবেৎ"।

বাঙ্গলার মেরুদণ্ড যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল বঙ্কিম তখন বাঙ্গালীকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাই বাঙ্গলার সমাজের জন্যই তিনি ব্যষ্টির আত্মবলির ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। দেশের একান্ত প্রয়োজনের

তাগিদ তাঁহার বিশ্ববোধ পূর্ণরূপে জাগ্রত করিয়া তুলিবার সুযোগ দেয় নাই। জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে উজ্জীবিত না হইলে বিশ্বজনীনতায় অবগাহন সম্ভবও নয়। বঙ্কিম ঘা মারিয়া আমাদের মেরুদণ্ড যখন অনেকটা সোজা করিয়া আনিয়াছেন তখনই রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। তাই রবীন্দ্রনাথে বিশ্ববোধ প্রধান হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। জাতীয়তার গণ্ডী যে বিশ্বজনীনতার নিকটে অতি তুচ্ছ তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন 'গোরা'র মধ্যে। গোরা নিজেকে হিন্দু বলিয়া মনে করিয়া হিন্দুর সমস্ত সংস্কারকেই আপনার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল। পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়িয়া আমরা কোন না কোন এক বিশেষ সংস্কারের ভূতকে স্কন্ধে টানিয়া বেড়াই—এবং উহাকেই আমাদের প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া অপরের নিকট হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখি। অমৃতের পুত্র হইয়াও আমরা খণ্ডের মধ্যেই নিজেদের ডুবাইয়া রাখি। নিজেকে আইরীশ জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোরার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। আমি হিন্দু অথবা আমি মুসলমান ইহা জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হইতেই উহার সংস্কারগুলি আমাদের মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়। তাহার বাহিরে আর কোন পথ খুঁজিয়া মেলে না। হিন্দু, মুসলমান জৈন, ক্রিশ্চান যাহাই হই না কেন আমি মানুষ এবং অন্যেও মানুষ এই বোধ যেদিন আসিবে সেদিনই সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হইয়া যাইবে। কবি মানুষকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিতে চাহেন, তিনি বলেন—

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি সবে
সে জাতির নাম মানব জাতি।

জগৎ জুড়িয়া এক মানব জাতির অস্তিত্ব সন্দীপ স্বীকার করে নাই। মানুষকে সে নানা স্তরে ভাগ করিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। তাহার প্রচণ্ড ইচ্ছা সমস্ত জগৎকে নিজের পায়ের তলায় টানিয়া আনিয়া দলিত করিতে চাহিয়াছে। তাই তাহার মুখে শুনি, "আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সঙ্কোচ নেই।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন ভোগের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি চাই। তাহা না হইলে সত্যকে জানা যায় না, সত্যকে না জানিলে শিব ও সুন্দরের সাক্ষাৎ লাভও সম্ভব নয়। সন্দীপ

হয়ত' বলিয়া বসিবে আমি যদি সুখ পাই, জগৎকে যদি আমার ভোগে লাগাইতে পারি তবে শিব ও সুন্দরের কল্পনায় আমার কি কাজ? ওই সুখ এবং ভোগই ত' আমার পক্ষে শিব ও সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ যেন ইহারই উত্তরে তাঁহার 'সৌন্দর্য্য-বোধ'-এ বলিয়াছেন, "সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয়, নিখিলের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্য্যের বিরোধ চোখে ধরা পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ-সংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারিদিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তিরও উৎপাত যখন ঘটে, তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি লাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। * * * * এই জন্যই সৌন্দর্য্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই। তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।"

এই বড়োর সঙ্গে ছোটকে, সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। নিখিলেশ তাই বিমলাকে ঘরের মধ্যেই পাইতে চাহে না, কারণ সে ত' সত্যিকার পাওয়া নয়। সে বিমলাকে বলে, "আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে," কারণ ঘরের মধ্যে "আমাকে দিয়ে তোমার চোখ-কান-মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জাননা, কাকে পেয়েছ তাও জান না।"

বঙ্কিমের জাতীয়তাও সময়ে সময়ে বিশ্বজনীনতায় মুক্তি লাভ করিয়াছে। কমলাকান্তের জবানীতে তিনি বলিয়াছেন, "আমিও কেন ওই অনন্ত জনস্রোত-মধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দ-তরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্‌বুদ্‌ সমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ্‌ না হই! বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র,—আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?" জগতের মধ্যে নিজেকে মিলাইয়া দিতে কতনা আনন্দ! পরমপুরুষকে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ—আনন্দের উপরে আর কিছু নাই। সকলের মধ্যে ডুবিতে পারাকেই বঙ্কিম আনন্দ বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও তাহাই বলেন। জগৎ রহিয়াছে বলিয়াই না আমার মূল্য! জগতের মধ্যেই আমি। আমিত্ব

লইয়া কি আদায় করা যায় তাহা তিনি জানিতে চাহেন না, কারণ-

জগৎ হ'য়ে রব
একেলা রইব না
মরিয়া যাইব একা হ'লে
একটি জলকণা।

কিন্তু আমি মানুষ হইয়া জলকণা হইব কি করিয়া? ব্যক্তিত্ব বলিয়া কি কিছুই নাই? বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ কেহই ব্যক্তিকে অস্বীকার করেন নাই। গঙ্গা নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বঙ্কিমের সমাজ সেই সাগর। গঙ্গা দুই পাশের জমি উর্ব্বরা করিয়া বহিয়া চলিয়াছে—ব্যক্তিও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধন করিতে করিতেই চলিবে। কেবলমাত্র সমাজের বিরোধীতার মধ্যেই কি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া ওঠে? প্রতাপের মধ্যে কি ব্যক্তিত্ব দেখি নাই? ওসমানের কি ব্যক্তিত্ব নাই বলিয়া মনে করিব? যে গঙ্গায় অবগাহন করে সে পুণ্য সঞ্চয় করে—যে চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-ওসমানকে জানিয়াছে সেও পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে। হীরা দাসী, রোহিণী সমাজের বিধির মূলে কুঠারাঘাত করিতে গিয়াছিল বলিয়া নিজেরাও মরিল। যে সাগরে নদী গিয়া মিলিবে সেই সাগরকেই ধ্বংস করিলে নদী বাঁচিবে কোন্ উপায়ে? এই রূপেই সমাজ ও ব্যক্তিকে বঙ্কিম যুক্ত করিয়াছেন। নিখিলেশ 'ইচ্ছা' হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাই তাহার ব্যক্তিত্ব খুব উজ্জ্বলরূপে চোখে না পড়িলেও প্রভাব বিস্তার করে। সে জানে যে সে দোষে-গুণে মিশ্রিত মানুষ। তাই তাহার মধ্যে যেটুকু ভাল সেটুকুই সে সমাজকে দিবে—"আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যই বলছি, আমার যা কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।" মন্দটুকু হইতে দেশকে রক্ষা করা চাই—ছোট তরীখানা ভরিয়া তুলিতে যদি হয় তবে সোনার ধানেই তাহা ভরিয়া দেওয়া ভাল। সন্দীপের সম্মোহনকারী ব্যক্তিত্ব মানুষকে ঘা দিতে গিয়া মরিল। কিন্তু এ মরা হীরা দাসী বা রোহিণীর মত নহে। তাহার অন্তরের গোপন মাণকোঠায় যে শুভবুদ্ধির বীজ লুকাইয়া ছিল তাহাই হৃদয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এমন এক 'কিন্তু'র সৃষ্টি করিল যাহাকে দলিত করিয়া অগ্রসর হইবার শক্তি আর তাহার হইল না—"মক্ষীরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের

নির্ম্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে—রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়—তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই।" বৃহত্তের সহিত সংঘর্ষে ক্ষুদ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মানব ধর্ম্মের সহিত সংঘাতের ফলে গোরার হিন্দু আচারও তাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সমাজের সহিত এইরূপে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

মানব প্রেমিক বঙ্কিম প্রেমকে কোথাও ছোট করেন নাই। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বপ্রেমের সন্ধান পাইবে বলিয়াই তিনি মনে করিতেন। যে প্রেম স্বামীকে স্ত্রীর মধ্যে এবং স্ত্রীকে স্বামীর মধ্যে পাক খাওয়াইয়া মারে তাহা প্রেম নয়, মোহ। সীমা ও অসীম—ইহাদের একটাকে ফাঁকি দিয়া আর একটাকে লাভ করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতেও তাই দেখিতে পাই, "ভালোবাসা মাত্রেই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।" বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রেমকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত প্রবর চন্দ্রশেখরকেও তিনি ক্ষমা করেন নাই—বিদ্যা অর্জ্জনের সুবিধার জন্য তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মসঙ্গিনীকে এত ছোট করিয়া দেখিতে নাই। অধ্যাত্মবোধ অপেক্ষা উচ্চতর বোধ আর নাই, স্ত্রী সেই কার্য্যে প্রধান সহায়। তাই বঙ্কিম চন্দ্রশেখরকে দিয়া পুঁথিগুলি পোড়াইলেন। পণ্ডিত প্রেমিক হইলেন। রবীন্দ্রনাথ অন্যদিক দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে স্ত্রীর মধ্যেই সব নিঃশেষ করিয়া দিলে প্রেমের মৃত্যু ঘটে, তাই মহেন্দ্র-আশার মিলনে ছেদ পড়িয়া গেল। আশাকে সম্মুখে রাখিয়া সে মাতা ও প্রিয় বন্ধুকে আড়াল করিতে গিয়াছিল বলিয়াই আশাও আড়ালে পড়িয়া গেল। জগতের বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে কাহাকেও পৃথক করিয়া দেখিলে সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়। খণ্ড খণ্ড চিত্র দেখিয়া জগতকে উপলব্ধি করা যায় না। এই খণ্ড চিত্রগুলি কোন এক অখণ্ড রূপের অভিব্যক্তি এ বোধ না জাগিলে কোন কিছুই জানা হয় না—

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।

বস্তুর মধ্যে ডুবিয়া গেলেও চলিবে না আবার বস্তুকে বাদ দিয়া নিছক ভাবরাজ্যে বিচরণও কোন কাজের কথা নয়। বাল্যকাল হইতেই ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ প্রকৃতি উপযুক্ত প্রতিশোধই গ্রহণ করিয়াছে। সংসারকে পাশ কাটাইয়া স্বর্গলাভ হয় না। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সংসারের বন্ধনকেই পাথেয় করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসী সমাজ-সংসার অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বহুদিনের বৈরাগ্য ও সাধনা সত্ত্বেও শিশুর স্নেহই জয়যুক্ত হইল। গুহার অন্ধকারকে আলোকিত করিবে কাহার মুখের জ্যোতি? স্নেহ-ভালবাসা ব্যতীত এ অন্ধকার দূর করিবার মত আলো আর কোথায় আছে?

যার খুসি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি' ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা মিথ্যা লভো সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি' নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।
কারণ— বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

জগৎ ত' মায়া নহে—ইহা তাঁহারই প্রতিভাস। বিশ্বের সৌন্দর্য্য যদি চোখে না পড়িল তবে তাঁহাকে কি অনুভব করিলাম? প্রতিটী অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া তিনিই ত' প্রকাশিত হন! তাই—

যে কিছু-আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে!

আনন্দরূপমমৃত যদ্বিভাতি—যাহা কিছু প্রকাশিত তাহা তাঁহারই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। কিন্তু যাহা অন্যায় এবং অসুন্দর? আনন্দরূপ এবং অমৃতরূপের সহিত তিনি অসুন্দরের সামঞ্জস্য করিবেন কি করিয়া? তাই অসুন্দরকে তিনি স্বভাবের বিকৃতি বলিয়া মনে করেন। সেইজন্যই সর্ব্বত্র তিনি অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। মানুষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া'ছলেন। দেশের মুক্তিই তাঁহার কাছে সব ছিল না—মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁহার উপাস্য। এই জন্যই নিখিলেশ 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রটি চূড়ান্ত করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। "তিনি বলতেন, দেশকে আমি

সেবা করতে রাজী আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্ব্বনাশ করা হবে।" বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব অপেক্ষা রাখীবন্ধনকেই তিনি বড় স্থান দিয়াছিলেন। সকলে মিলিয়া এক—'প্রত্যেকের তরে সকলে আমরা' এই বোধ জাগাইয়া সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু রাজনীতি তাঁহাকে টিঁকিয়া থাকিতে দেয় নাই—সমস্ত নীতিকে অগ্রাহ্য করাই যে রাজনীতি ইহা উপলব্ধি করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হয় নাই। মানুষকে ভালবাসিতেন বলিয়াই তিনি তাহাকে মহান করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, তাই 'political agitation'কে তিনি ভিক্ষাবৃত্তি বলিয়া মনে করিতেন, "ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই।......ইংরেজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী।" মানুষের নীচতা তাঁহাকে সময়ে সময়ে উত্তেজিত করিয়া তুলিত। 'টৌনহলের তামাশা'য় তাই লিখিয়াছিলেন, 'সেদিন টাউনহলে এক মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়লোক বড় বড় পাগ্‌ড়ি পড়িয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজনৈতিক 'agitator'দের তিনি তারাবাজীর সহিত তুলনা করেন—'ভারতী'তে লিখিয়াছেন, "এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নিগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—ও তারাবাজির মত উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে—অনেকদূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিভিয়া যায়, ও ধপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ ছুঁচো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় না, আর ঘরের কোণে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বলিলেও অনেক কাজ দেখে।" এই তারাবাজির দল চমক সৃষ্টি করে, বাহবাও পায় কিন্তু একদিন তাহাদের অন্তরের দৈন্য ধরা পড়িয়া যায়। রাজনৈতিক ডিপ্লোমেসিতে মিথ্যাচারেরই জয়। তাই সন্দীপরা নিজেদের ভোগের অধিকারী বলিয়াই মনে করে—কথায় তুবড়ী ফুটাইয়া সর্ব্বগ্রাসী দৃষ্টি মেলিয়া দুই হাত বাড়াইয়া সব কিছুই সবলে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিবার আশা কোনদিন ইহারা দমন করিতে পারে না—"যা আমি চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব।" পেট ভরাইবার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়কে ইহারা

ভুলিয়া যায় এবং তাহারই ফলে সব কিছুই হারাইয়া বসে। "মানুষের মন চায় মানুষের মন"—এই সহজ কথাটা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই ওই এক ফাঁক দিয়া তাহাদের জীবনে সমস্ত ফাঁকী নামিয়া আসে। বিমলাকে প্রায় অধিকার করিয়া ফেলিয়াও সন্দীপ তাহাকে হারাইল। মস্তিষ্কের পথে যাহার আনাগোনা হৃদয়ের সংবাদ সে রাখিবে কেমন করিয়া? মস্তিষ্ক চমক্ লাগায়, হৃদয় আকর্ষণ করে। চমক্ একদিন ভাঙ্গিয়া যায়, সেদিন হৃদয় আর দাঁড়াইবার স্থান পায় না। বিমলা ও সন্দীপের মধ্যে হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান ছিল না। যে সমস্ত বাঁধন ছাড়িয়া দিয়াছিল বিমলা তাহারই অন্তরে বিরাট প্রেমের সন্ধান পাইল। বড় প্রেম এমনি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াই সব জুড়িয়া বসে।

এই হৃদয়ের ব্যাপারে বঙ্কিমের সহিত আমরা রবীন্দ্রনাথের একটা পার্থক্য দেখিতে পাই। বঙ্কিম ভালবাসাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'প্রীতিই ঈশ্বর'—তথাপি সেই যুগের শৈথিল্য দেখিয়া তিনি হৃদয়কে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। 'রাম' নাম জপ করিতে করিতেই একদিন দস্যু রত্নাকর বাল্মিকী হইয়াছিলেন—এই আদি কবি হৃদয়কে চিনিয়াছিলেন। একদিন যাহা হৃদয় দিয়া অনুভব না করিয়া কেবল অভ্যাসের বিষয় ছিল তাহাই পরে তাঁহার হৃদয়ের জিনিস হইয়া উঠিয়াছিল। হৃদয়কে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া তোলা যায় বলিয়াই বঙ্কিম বিশ্বাস করিতেন—শৈবলিনীকে তাই রমানন্দ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, "যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না।" তাই সমাজকে যে ভালবাসিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই তাহাকে তিনি জোর করিয়া সমাজের খুঁটায় বাঁধিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষের শুভবুদ্ধিতে বিশ্বাসবান—তাই তিনি বিপরীত দিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি হৃদয়কেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। চৈতন্যর কাছে নিমাই পণ্ডিত ভাসিয়া গিয়াছিল, হৃদয়ের নিকট মস্তিষ্ক চিরদিনই পরাজিত হয়। তাই তাঁহার গোরা বুদ্ধি দিয়া যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়া সেই বিভেদ ভুলিতে আরম্ভ করিল। সুচরিতার প্রতি প্রেম তাহার এতদিনকার সমস্ত ভাবনার কোথায় যেন ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে। "গোরাকে আবার তাহার দলের লোকের মাঝখানে তাহার পূর্বাভ্যস্ত কাজের মধ্যে আসিয়া

পড়িতে হইল। কিন্তু বিস্বাদ, সমস্তই বিস্বাদ। এ কিছুই নয়। ইহাকে কোন কাজই বলা চলে না। ইহাতে কোথাও প্রাণ নাই। এমনি করিয়া কেবল লিখিয়া পড়িয়া কথা কহিয়া দল বাঁধিয়া যে কোন কাজ হইতেছে না বরং বিস্তর অকাজ সঞ্চিত হইতেছে একথা গোরার মনে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন এমন করিয়া আঘাত করে নাই।" প্রেমের শক্তির নিকট অন্য সবই পরাভূত হয় বুঝিতেন বলিয়াই তাঁহার বিনয় বলিয়াছে, "আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি—মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্ত্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম" (গোরা)।

রাজর্ষিতে দেখি হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের সংঘাত। দেবতার পূজায় একদিকে অনুষ্ঠান মাত্র অপরদিকে হৃদয়। তাই রঘুপতি বুদ্ধি দিয়া জয়লাভ করিয়াও রাক্ষসী প্রতিমাকে গোমতীর জলে বিসর্জ্জন দিয়া গোবিন্দমাণিক্যের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। হৃদয়ের সংবাদ যাহারা রাখে না সহসা একদিন তাহারা চারিদিকে অন্ধকার গহ্বর দেখিয়া শিহরিয়া ওঠে। হৃদয়ের দাঁড়াইবার মত এতটুকু স্থানও তাহারা কোনদিকে দেখিতে পায়না। কিন্তু যেখানে হৃদয় আছে সেখানে একটীমাত্র রাজসিংহাসন সহস্র হৃদয়-সিংহাসনে রূপান্তরিত হইয়া যায়—কোনদিকে কোন ফাঁক না থাকায় এক আনন্দ-তরঙ্গ সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিয়া ফেরে। সেখানে শুধুই আনন্দ। এক হৃদয়ের আনন্দ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। তাইত' বিল্বন ঠাকুর বলেন, 'মহারাজ আপনাকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সকলকেই জয় করিয়াছেন'। রবীন্দ্রনাথ রাজর্ষিতে আর একটা বিশেষ কথা বলিয়াছেন। হৃদয় মস্তিষ্ক অপেক্ষা অনেক বড় বটে কিন্তু এই হৃদয়ের কার্য্যও দুইপ্রকার। নিষ্ক্রিয় প্রেম কেবল জগতের প্রতি এক অভিলাষ পোষণ করিয়াই থাকে—কিন্তু অন্যকে সঞ্জীবিত করিতে চাই সক্রিয় প্রেম। সকলকে ভালবাসিয়া সকলের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেই জগতকে সুন্দর করিয়া তোলা যায়। কেবলমাত্র আশা পোষণ করিলেই ত' চলিবে না। বিল্বন তাহার প্রমাণ। গোবিন্দমাণিক্য নিজেও তাহা বুঝিয়াছিলেন। "গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন, নির্জ্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না, তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোন অভিমান নাই।" তাই গোবিন্দমাণিক্য নিজেও প্রকৃতিরই

মত নিজের 'বিজনে সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে' বাহির হইলেন। অন্তরের অসীম প্রেম তাঁহার এই কার্য্য সহজ করিয়া দিল।

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—বঙ্কিমও ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কাজ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চন্দ্রশেখরের হৃদয় আছে বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ের স্পর্শ আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করি। তাঁহার বাইশ বৎসর বয়সের উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র উদয়াদিত্য ও তাহার স্ত্রী সুরমার মধ্যে, বসন্তরায়ের মধ্যে এমন কি দরিদ্র সর্দ্দার রামমোহন মালের মধ্যেও মানবের প্রতি গভীর প্রেম বর্ত্তমান। উদয়াদিত্য রাজসিংহাসনের লোভ জয় করিয়া পিতার বিরক্তিভাজন হইবার শক্তি কোথায় পাইল? যে আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই তাহারই শেষ কিসের জোরে সম্ভব হয়? মানুষের আকাঙ্ক্ষা কেবলই অধিকার করিয়া লইতে চাহে। যতদিন 'না পাওয়া' থাকে ততদিনই পাইবার আকাঙ্ক্ষাও থাকে। অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসার জোরে উদয়াদিত্য ও গোবিন্দমাণিক্য সকলকে অধিকার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং রাজ-সিংহাসন তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইবেই ত'! ভারতীয় সাধনার আদর্শ ইহাই—পাশ্চাত্তের রাজারা শাসন করেন আর ভারতের শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য সীতাকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বসেন। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনা কেবলমাত্র এই জগৎ ও এই জগতের মানুষের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় নাই। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যেও একটা যোগ অনুভব করিয়াছেন। "আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাত্র মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।" তাই তিনি যেমন নিজের মধ্যেই সব শেষ করিয়া দিতে পারেন নাই, একটী জীবনকেও সব শেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যুগ যুগান্ত ধরিয়া তাঁহার নানারূপের মধ্যে এই জীবন একটী অংশ মাত্র। সুতরাং আজ যাহা পাইলাম তাহার মধ্যে বহু পুরাতন কোন এক জীবনের চাওয়া যে লুকাইয়া নাই তাহা কে বলিতে পারে?

তাই নৌকাডুবিতে কমলা যখন রমেশকে ছাড়িয়া যায় তখন আমরা বিস্মিত হইলেও তিনি ইহা সহজ মনেই গ্রহণ করেন। জীবনদেবতার উপলব্ধি যে তাঁহার অন্তরের জিনিষ। এই বিংশ শতাব্দীর বস্তুতন্ত্রের যুগে আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবি কমলার পক্ষে ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল! এতদিন নিকটে থাকিয়া স্বামী জানিয়া রমেশকে সে মনে মনে পূজা করিয়াও কোন্ প্রলোভনে তাহাকে ছাড়িয়া দুঃখের মধ্যে ঝাঁপ দিল? কিন্তু ইহা ত' প্রলোভন নহে—ইহা প্রলোভন জয়। যাহার সহিত জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ তাহাকে সে ছাড়িবে কোন্ উপায়ে? এই জীবনকে গত জীবনগুলি হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে অখণ্ড সত্য উপলব্ধি ত' সম্ভব নহে। খণ্ডের মধ্যে, মিথ্যার মধ্যে কেবলই লাভের কথা। যখন নিজেকে সকলের সহিত মিলাইয়া দেখি তখন নিজের বলিয়া কিছুই থাকে না, যখন সকলের হইতে পৃথক করিয়া কল্পনা করি তখনই 'আমি' এবং 'আমার' বোধ মাথা চাড়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। তাই গ্রহণ অপেক্ষা ত্যাগ অনেক বেশী সুন্দর।

এই সর্ব্বানুভূতিই তাঁহার সাহিত্যের মূল কথা। চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতিতে যুক্তি ও বিশ্লেষণ নিতান্ত কম স্থান জুড়িয়া নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম চরিত্রগুলিকে একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলেন। বঙ্কিমের যুগ যুক্তির পত্তনের যুগ। এখনকার মত এত জিজ্ঞাসা তখন প্রত্যেকের চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠে নাই। তাই বঙ্কিমের পক্ষে রোমান্স রচনা সম্ভব হইয়াছিল—যেখানে আমাদের অবিশ্বাস মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছে সেখানেই তিনি তাঁহার অন্তরের বিশ্বাসে আমাদের অবিশ্বাসকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম যুগে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র মত অর্দ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু যুক্তির যুগে ইহার জের টানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমরা যুক্তি দিয়া বুঝিতে চাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইয়াছে। তাই রোমান্স ছাড়িয়া তাঁহাকে উপন্যাসের ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের শৈথিল্য, আমাদের অবিশ্বাস দেখিয়াই বঙ্কিম জোর করিয়া আমাদের সমাজের সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, হৃদয় না থাকিলেও নাম জপ করিতে করিতেই একদিন আমরা উদ্ধার পাইয়া যাইব। রবীন্দ্রনাথ সেই নাম জপকেই সরল করিয়া

তুলিয়াছেন হৃদয়ের স্পর্শ দিয়া। কিন্তু সমাজ লইয়া তিনি বঙ্কিমের মত মাথা ঘামান নাই। সমাজের বিরুদ্ধে যেমন অসি ধারণও করেন নাই, উহার সহিত গাঁথিয়া দিবার জন্যও আগ্রহ দেখান নাই। বৃহতের সহিত দ্বন্দ্বে ছোটকে তিনি সর্ব্বদা পরাভূত করিয়াছেন—মানবতার নিকট জাতীয়তা হার স্বীকার করিয়াছে। সমাজের সংস্কার যেখানে মানবত্বাকে আঘাত করিতে গিয়াছে সেখানে সমাজকে তিনি ছাড়িয়া দেন নাই। হিন্দু সংস্কার অথবা ব্রাহ্ম সংস্কার কোন কিছুই তাই ললিতা ও বিনয়ের প্রেমকে আড়াল করিতে পারে নাই। সংস্কার মুক্ত আশুবাবু ও আনন্দময়ী ইহাদের বরণ করিয়া লইলেন। গোরার নিষেধকেও আনন্দময়ী গ্রাহ্য করেন নাই। সত্যের পথ কেহ রোধ করিতেও পারে না। বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম ক্ষেত্রের দিকে তিনি আমাদের অগ্রসর করাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

BAGHBAZAR READING
CALCUTTA

শরৎচন্দ্র

সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন, "বিষ্ণুশর্ম্মার দিন থেকে আজও পর্য্যন্ত আমরা গল্পের মধ্যে থেকে কিছু একটা শিক্ষালাভ ক'রতে চাই।" সেই সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন, "মন্দের ওকালতী করিতে কোন সাহিত্যিকই কোনদিন সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হয় না, কিন্তু ভুলাইয়া নীতি শিক্ষা দেওয়াও সে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেনা।" হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশকেই তিনি সাহিত্য বলিয়া মনে করেন। বাহিরের জগতের যাহা চোখে পড়ে তাহা দেখিয়া জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমাদের মন নানা কল্পনা করে—এই কল্পনার মধ্যে যাহা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীন বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য তাহাই সাহিত্যের বিষয়। কিন্তু ইহাতে লেখকের নিজের কথা থাকিয়া যাইতে বাধ্য। সুতরাং সাহিত্যে প্রচারনীতির প্রভেদ না হইয়া উপায় নাই। সেইজন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে শরৎচন্দ্র ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, "সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল দিক হইতে তাহাকে উন্নত করা।" ইহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই নীতি শিক্ষা দিবার কথাই হইল না কি?

নীতি বলিতে কি বুঝিব? হাজার বৎসর পূর্ব্বে নীতির যে সূত্র ছিল আজিও কি সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই মানুষ গণ্ডী টানিয়া চলিবে? হাজার বৎসরের অগ্রগতিকে স্মরণ করিয়া এই জড় সমাজের চারিদিকের অন্ধকারের উপর নূতন আলোক রশ্মি যদি ফেলিতে না পারি তবে মানুষের মৃত্যু রোধ করিবে কে? সাহিত্যিকের কাজই ত' এই আলোক বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দেওয়া! মানুষের মঙ্গলের কল্পনাতেই একদিন নীতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমও মনে করিতেন, সমাজের মধ্যে মানুষকে ঠেলিয়া দিলেই সমষ্টির ভিতর দিয়াই ব্যষ্টি সার্থক হইয়া উঠিবে। কিন্তু সমাজ যখন বেণী ঘোষাল-গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের হাতে আসিয়া পড়ে তখন তাহার মধ্যে ব্যষ্টিকে ঠেলিয়া দিলে সমষ্টিরও কল্যাণ হয় না ব্যষ্টিরও মৃত্যুই ঘটে। তাই আজিকার দিনের যে ব্যবস্থা আজিকার মানুষকে মুক্তি দিতে পারে তাহা পুরাতন দিনের নীতির ঘোর বিরোধী হইলেও আজিকার দিনের পক্ষে তাহাই

ত' নীতি। মানুষ একস্থানে স্থির হইয়া নাই—তাহার নীতিবোধের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথ বৃহতের সহিত ছোটকে মিলাইয়া সুন্দরের সন্ধান করিয়াছেন। একের মঙ্গল যেখানে অন্য দশজনের ক্ষতি সাধন করে না তখন তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধা নাই—কিন্তু যখন তাহা অন্যের অমঙ্গল করে তখন চক্ষু বুঁজিয়াই তাহাকে দুর্নীতি বলা যাইতে পারে। এই জন্যই ললিতা-বিনয়ের মাঝে বাধাস্বরূপ হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের নীতিকে রবীন্দ্রনাথ তুচ্ছ করিয়া দিয়াছেন। নীতিবোধের ইহাই ত' মাপকাঠি। নীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলেও শরৎচন্দ্র কতকটা রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করিয়াছেন। সেইজন্য আইন লঙ্ঘন করিয়াও চাষীদের মঙ্গলের জন্য রমেশকে হাতে লাঠি তুলিয়া লইতে হইয়াছিল। দশজনের ক্ষতি করিয়া একের পুষ্টি সমস্ত আইনের সমর্থন সত্ত্বেও দুর্নীতিগ্রস্ত। কত মৃণাল, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মীই না জানি প্রতিনিয়ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে—ইহাদের কি কোন পথ নাই? এতগুলি হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া সমাজ কাহার মঙ্গল করিবে?

উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই বোধ হয় বঙ্কিম সর্ব্বত্র সমাজকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ সম্বন্ধে বড় মাথা ঘামান নাই। শরৎচন্দ্র এক মস্ত জিজ্ঞাসা লইয়া সমাজের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তুমি 'ভাল' বলিয়া যাহাকে বহুদিন ধরিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছ তাহা হইতে আজ আমরা কতখানি 'ভাল' পাইতেছি? তোমার আইন বড় না মানুষের হৃদয় বড়? কোন্ ভ্রান্তি বশে সমাজ আজ গতি হারাইয়া জড় হইয়া গেল? অনার্য্যদের অন্যতম বিবাহপ্রথা বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিয়া লইয়া পঞ্চ ভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে বিবাহ করিল তখন ত' কই সেদিনের সমাজ তাহাকে ছিঃ ছিঃ করিয়া ঠেলিয়া দেয় নাই। সমাজ তখন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে নাই বলিয়াই মানুষগুলিও প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল—আর্য্য-অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া তাই এক নূতন বলিষ্ঠ জাতি গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সমাজ রাস টানিয়া ধরিয়া নিজেও জীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে মানুষগুলিকেও শীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কিরণময়ী তাইত' বলে, "তোমাকে ত' অনেকবার বলেচি ঠাকুরপো, তোমার ওই সুপবিত্র অপবিত্র জ্ঞানটা সংস্কার—যুক্তি নয়। এই সংসারেই স্ত্রী পুরুষের এমন অনেক মিলন হয়ে গেছে যাকে কোন মতেই পবিত্র বলা চলে না। আমি নজীর তুলে আর কথা

বাড়াতে চাইনে ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছে হয় ইতিহাস পুরাণ পড়ে দেখো। অথচ, সে সব মিলনকেও সমাজ স্বীকার করেছিল এবং বিয়ের মন্ত্র দিয়েও সুপবিত্র করে নেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরপো, আমাদের ঐ পাথুরেঘাটার বাড়ীর পাশে যদি কণ্বমুনির আশ্রম থাকত, তা'হলে শকুন্তলা যে কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন, তাতে শুধু মুনি ঠাকুরের জ্ঞাতগুষ্ঠি নয়—সমস্ত পাথুরেঘাটার লোককে একঘরে হয়ে থাকতে হত।"

যে পুরাতন সমাজের দোহাই দিয়া আমরা আজ চারিদিক হইতে বজ্র আঁটুনি টানিয়া দিতেছি সেই পুরাতন সমাজ ত' কোনদিনই মানুষের কণ্ঠরোধ করে নাই। উর্ব্বশীর নৃত্য-গীত দেবতা ও মুনি ঋষিরাও উপভোগ করিতেন, তাহার অভিশাপে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের কি হইয়াছিল তাহাও আমরা জানি। স্বর্গের সামান্য একটা বারবণিতাকে হিন্দু সমাজ এতখানি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল কেন? কেবল কি রুচি বিকৃতিই মাত্র? যে নিজের কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করে তাহার কাজটা যাহাই হউক দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও সে নিম্নস্তরের সমাজ সেবক নহে। তাই বিশ্বামিত্র-দুর্ব্বাশার অভিশাপের ন্যায় তাহার অভিশাপও ফলিয়া যায়। বর্ত্তমান সমাজ সেই আদর্শটুকু ভুলিয়া বসিয়াছে, কেবল ছোঁওয়া ছুঁই-ই বাঁচাইয়া অঙ্গগুলি একে একে পঙ্গু করিয়াও সে কোন মতে টিঁকিয়া থাকিতে চায়। সমাজের এই রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগাইয়া তোলাই শরৎচন্দ্রের কাজ ছিল। এ ত' সমাজকে আক্রমণ নহে, এ সমাজের কুসংস্কার ও দম্ভের বিরুদ্ধে মনকে সঞ্জীবিত করা মাত্র। কিরণময়ীর মুখ দিয়া তাই তিনি বলিয়াছেন, "সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের দম্ভকে আঘাত করা এক জিনিষ নয়। তোমাকে পূর্ব্বেই ত বলেছি সব জিনিসেরই একটা সত্যিকার অধিকার আছে। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সেই সত্যকার সীমাটি লঙ্ঘন করে তখন তাকে আঘাত কর্ত্তেই হয়। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।" সমাজকে ধ্বংস করিলে যে মানুষের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না তাহা শরৎচন্দ্র জানিতেন। কিন্তু সমাজকে পরিচ্ছন্নও করা চাই—অন্যথায় তাহার স্বাস্থ্যহানি হইবেই। সুস্থ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের মনকে সমাজের দিকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন যাহাতে আমরা উহার আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিতে পারি। যাহা পাইয়াছি গতানুগতিক ধারায় তাহাকেই বরণ করিয়া লওয়া ভুল। কারণ যাহাকে মানিতেছি তাহাকে মানা চলে কিনা তাহা বিচার করিয়া

দেখা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। বৈজ্ঞানিক যুগে ইহাই ত' স্বাভাবিক! হারাণের শিষ্যা কিরণময়ীকে দিয়া শরৎচন্দ্র অনেক কথাই বলাইয়াছেন, এখানেও তাহার মুখেই শুনি, "যা' সত্য তাকে সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক্, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হ'য়ে যাক্। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বশে হোক্, মমতায় হোক্, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক্, চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই।......সত্য মিথ্যা যাই হোক তাকে বুদ্ধি পূর্ব্বক গ্রহণ করা উচিত। চোখ বুজে মেনে নেওয়ায় কোন সার্থকতা নেই। তাতে তারও গৌরব বাড়ে না তোমারও না।"

সমাজকে ছাঁটিয়া কাটিয়া পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিয়া তুলিবার ইঙ্গিতই শরৎচন্দ্র করিয়াছেন, উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোথাও প্রশ্রয় দেন নাই। সমাজের অন্যায়কে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাঁহার নায়ক-নায়িকারা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া পথে বাহির হয় নাই। কারণ তিনি জানিতেন যে ভাঙ্গার শেষ নাই। ভাঙ্গিবার আনন্দে যাহা কিছু মঙ্গলের তাহাও হয়ত' মানুষ একদিন দুই পায়ে দলিয়া যাইবে। নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট ভাবে সর্ব্বদিকের শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়াও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিবর্ত্তন সাধনই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বিদ্রোহিনী কমল পর্য্যন্ত অতি সংযমী। একাদিক্রমে তিনটী স্বামী গ্রহণ করিয়াও আহারে-পোষাকে-পরিচ্ছদে তাহার মত সংযম কয়জনে করিতে পারে! পুরুষ ধরার ব্যবসা ত' তাহার নহে। মন যেখানে নাই সেখানে কিছুই নাই বলিয়াই সে মনে করে। মন ও হৃদয়কে যে এতখানি শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে সে কোনদিন কি উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে? এমনি যে নারী সেই ত' সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার উপযুক্ত! নিজের প্রয়োজনের জন্য যে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ তাহাতে সমাজের মঙ্গল সাধনের কথা একেবারেই নাই—সে কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্যই। এইরূপ আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে দিয়া সমাজের কোন চিরস্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। অকস্মাৎ দেখিয়া কমলকে এইরূপ আত্মসুখপরায়ণ বলিয়া মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু সুখকে বড় বলিয়া গ্রহণ করিলে অনুষ্ঠানের পাকে জড়াইয়া খোরপোষ দাবীর সুবন্দোবস্ত সে পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে পারিত। তারপর স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে আর অসুবিধা কি? সুখকে বড় বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরে নাই

বলিয়াই বোধ হয় রাজেনকে সে সকলের অপেক্ষা ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল এবং বাহিরের সমস্ত অমিল সত্ত্বেও মনের দিক দিয়া আশুবাবুর সহিত মিলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এই প্রচ্ছন্ন ত্যাগের মন্ত্রে তাহার দীক্ষা ছিল বলিয়াই সে সমাজের বিরুদ্ধাচরণের উপযুক্ত।

ত্যাগকে তিনি অনেক বড় করিয়াই দেখাইয়াছেন। তাঁহার অন্নদা দিদি, সাবিত্রীরা কি প্রতাপ-বিনোদিনী অপেক্ষা কম ত্যাগশীলা? সমাজের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা কাহার না হয়? প্রতাপ রমানন্দ স্বামীর প্রশংসা পাইয়াছে; বিনোদিনী বিহারীর শ্রদ্ধা পাইয়াছে। কিন্তু অন্নদা দিদি কি পাইয়াছিলেন? সমাজের ঘৃণা এবং সাহ্‌জীর প্রহার। এই ত্যাগ স্বীকারকে কি আমরা একেবারেই অযথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি? বস্তু জগতের হিসাব মত অন্নদা দিদি কিছুই পান নাই—স্বামীর ভালবাসাও পান নাই যে মন তাঁহার ভরিয়া থাকিবে, তথাপি কি করিয়া বলি যে তিনি শূন্যেই বিচরণ করিয়া গেলেন। কেবলমাত্র পাওয়ার মধ্যেই সফলতা নাই। পাওয়াটাই সব হইলে ওই পাওয়ার লড়াইতেই বিশ্বসংসার ভরিয়া যাইত। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত'-ই যদি পৃথিবীর সকলের উপাস্য হয় তবে ঋণ আর দিবে কে? ঘৃত লইয়া দ্বন্দ্বেরই কি সীমা থাকিবে? তখন মানুষে মানুষে মিলিত হইবে কোথায়? তাই কেবলমাত্র ঘৃত পানেই সার্থকতা নাই—স্যার ফিলিপ সিড্‌নির ন্যায় 'thy necessity is greater than mine' বলিবারও প্রয়োজনীয়তা আছে। অন্নদাদিদি-সাবিত্রীরা রহিয়াছে বলিয়াই বাঁচিয়া সুখ আছে। কিন্তু এই সাবিত্রীদের দুঃখ দূর করিবার কি কোন উপায় নাই? শরৎচন্দ্র এই কথাটাই জানিতে চাহিয়াছেন। সমাজকে কি আমরা এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করিতে পারিনা যাহাতে সকলেই ঘৃতটুকু ভাগ করিয়া লইতে পারি?

সতীশকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াও সাবিত্রী তাহার ঘৃণা ভিক্ষাই করিয়াছে—"ওগো কে আমাকে বলে দেবে আমি কি করলে তোমার ঘৃণা পাব?" প্রতাপের 'জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা' অথবা বিনোদিনীর আত্মত্যাগ অপেক্ষা সাবিত্রীর ত্যাগ ছোট নহে। ত্যাগের মাহাত্ম্যকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা ইহাকে প্রকাশ করিয়াছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

লইয়া। বঙ্কিম প্রতাপ-দেবীরাণীকে আঁকিয়াছেন ত্যাগের মহৎ আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া তাহাতে আমাদের উদ্বোধিত করিবার জন্য। আমরাও যেন প্রতাপের মতই ত্যাগশীল হইতে পারি। বৃহতের সহিত ব্যক্তির সামঞ্জস্য সাধনে ত্যাগের মন্ত্রই একমাত্র ইষ্টমন্ত্র হইবার যোগ্য বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাই তাঁহার বিনোদিনী আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও উপন্যাসের এই পরিণতিতে আমরা একপ্রকার শান্তি অনুভবই করি—সর্ব্বদিকের সামঞ্জস্য যেন রক্ষিত হইল। বিনোদিনীর এই ত্যাগে সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের মনে কোন অভিযোগই জাগেনা। কিন্তু সাবিত্রীর ত্যাগ আমাদের মনে সমাজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। কেন এমনি করিয়া সাবিত্রীদের কেবল ত্যাগ করিয়াই যাইতে হইবে? উহাদের দূরে ঠেলিয়া দিয়া সমাজ লাভবান হইল না ক্ষতিগ্রস্ত হইল? পাঠকদের মনে এই প্রশ্নটাই জাগিয়া ওঠে। সমাপ্তিতে সাবিত্রী উপেন্দ্রের ভগ্নীর পর্য্যায়ে উন্নীত হইলেও আমাদের কেবলই মনে হয় যে তাহাকে ফাঁকী দেওয়াই হইয়াছে। এই উন্নতমনা নারীদের ঠেলিয়া দিয়া সমাজ কেবলই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অভয়া 'বর্ম্মার জঙ্গল' হইতে বাহির হইয়া আসা 'বন্য মহিষটাকে ছাড়িয়া রোহিণীদার সঙ্গেই যে মিলিত হইতে পারিল তাহাতে আমাদের মন যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। শরৎচন্দ্র সমাজের অত্যাচারে অত্যাচারিতদের রূপ এমনি করিয়াই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ভারতীয় আদর্শ বার বার করিয়া বলিয়াছে—পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নহে। কিন্তু আমরা সেই কথাটা মানিয়া চলিতে পারি নাই। তাই বোধ হয় পাপীকে ঘৃণা দেখাইয়া মনে মনে আমরা পাপকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। একটু তলাইয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব কেন ভারতীয় আদর্শ পাপীকে ঘৃণা করিতে নিষেধ করিয়াছে। স্বভাবতই মানুষ পাপী নহে—স্বভাবের বিকৃতিব ফলেই সে পাপ করিয়া থাকে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় পাপ করিতে বাধ্য হয়। 'বিড়ালে'র মধ্যে বঙ্কিম সেই কথাটা বলিয়াছেন, 'খাইতে পাইলে কে চোর হয়?' চুরিকে ঘৃণা করিতে পারি কিন্তু না খাইতে পাইয়া যে চোর হইয়াছে তাহাকে ঘৃণা করিব কোন্ যুক্তিতে? 'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' (বিড়াল) জাঁ ভল্‌জা যখন চুরি করেন তখন তাঁহার প্রতি কি আমাদের মন সহানুভূতিতে

ভরিয়া ওঠে না? মার্জ্জারী মহাশয়া তাইত' বলেন, 'চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন।' শরৎচন্দ্রও এইরূপই বলেন,—রায় দিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিও, কেন ইহা হইল। পাপকে ঘৃণা করিতে পার কিন্তু পাপীকে নহে—সে কেন পাপী হইয়াছে তাহা সহানুভূতির সহিত একবার ভাবিয়া দেখিও। মদ্যপানের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন কর আপত্তি নাই কিন্তু দেবদাস কেন মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিয়াছিল তাহা কি ভাবিয়া দেখিবে না? 'বেচা-কেনা ঘরের চক্রবর্ত্তী'র মেয়েকে যদি দেবদাস জীবনসঙ্গিনীরূপে পাইতে পারিত তবে দেবদা কি সার্থক হইয়া উঠিত না? জঁা ভল্‌জা চুরির জন্য নিজে অপরাধী নহে, অপরাধ সমসাময়িক ফরাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থার—দেবদাসের ধ্বংসের জন্য দেবদাস অপেক্ষা শতগুণে অপরাধী সেই সমাজ যে 'বেচা-কেনা ঘরের চক্রবর্ত্তী'র মেয়েকে কুলীনের গৃহে স্থান দিতে স্বীকৃত নয়। অনেকে হয়ত' বলিবেন, দেবদাস দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিল—প্রতাপের ন্যায় আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া সে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না কেন? জগতের সকলেই কিছু প্রতাপ হইয়া জন্মায় না। সাধারণের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, মুনি-ঋষিদের মধ্যেই বা কয়জন দধীচি হইতে পারিয়াছিলেন? হয় প্রতাপ হও আর না হয় ত' উৎসন্ন যাও ইহা ত' কোন যুক্তি হইতে পারে না। যদি সকলেই প্রতাপ হইতে পারিত তবে চিন্তার আর কি কারণ ছিল? কিন্তু জগৎটা যে দেবদাসের ন্যায় দুর্ব্বল চিত্ত মানুষেই পরিপূর্ণ। এই দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ মানুষগুলির কথা মনে করিয়াই শরৎচন্দ্র তাহাদের জন্য আর কিছু করিতে না পারিলেও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন। অথচ মজা এই যে ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া পাপীকে ঘৃণা না করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বলার জন্য শরৎচন্দ্র অন্যায়ের সমর্থক বলিয়া পরিচিত হইয়া গেলেন।

অনুভূতির প্রকাশকেই শরৎচন্দ্র সাহিত্য বলিয়া মনে করিতেন। জগৎকে দেখিয়াই এই অনুভূতি জাগ্রত হয়। ইহাতে কল্পনার রঙ্‌ থাকিবেই কিন্তু সেই রঙ্‌ যেন অভিজ্ঞতাকে পর্য্যন্ত একেবারে রঙিন করিয়া না ফেলে। শরৎচন্দ্রের

লেখনীতে জগৎ নিজের রঙ্ লইয়াই ধরা দিয়াছে। বাস্তব জগৎ হইতে নিজের জীবনদর্শনকে রূপায়িত করিবার উপযুক্ত চিত্রগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। তাই রাজলক্ষ্মী-সাবিত্রী-অভয়া-পার্ব্বতী-অন্নদাদিদি-দেবদাস-চন্দ্রমুখী-রমা প্রভৃতি আমাদের সম্মুখে ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি তাহারা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। এইখানে একটী বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রোহিণীকে উৎসন্নে দিবেন বলিয়াই তাহার দৈহিক শুদ্ধতার কথা লইয়া বঙ্কিম মাথা ঘামান নাই কিন্তু শৈবলিনীকে উদ্ধার করিতে হইবে বুঝিয়াই তিনি তাহাকে বিধর্ম্মীর ছোঁয়া জলটুকু পর্য্যন্ত পান করিতে দেন নাই এবং সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বার বার আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন। বিনোদিনী মহেন্দ্রের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াও তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। বিমলা সন্দীপের নিকট আত্মসমর্পণে উন্মুখ হইলেও সন্দীপ নিজের দুর্ব্বলতায় তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই—"আমি জানি দুবার-তিনবার এমন এক একটা মুহূর্ত্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের ওপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না,……। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি—নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিত প্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিইনি।" কাঞ্চনের প্রতি অতি লোভাতুর সন্দীপকেও তিনি কামিনীর প্রতি লোভ হইতে রক্ষা করিয়াছেন নিজের নায়িকার কথা মনে করিয়াই। সেই সন্দীপকেই তিনি বিমলাকে আলিঙ্গন করিতে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন তখন যখন বিমলা সন্দীপকে চিনিয়া লইয়াছে—যখন সে আত্মরক্ষায় সমর্থ। নায়িকার দৈহিক শুচিতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এই জিনিষটাই অনেক পরিমাণে দেখিতে পাই।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া সাহিত্যিক কিছু না কিছু প্রচার করিয়া থাকেন বলিয়াই শরৎচন্দ্র মনে করিতেন। সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "জগতের যা' চিরস্মরণীয় কাব্য ও সাহিত্য, তা'তেও কোন না কোন রূপে এ বস্তু আছে। রামায়ণে আছে, মহাভারতে আছে, কালিদাসের কাব্যগ্রন্থে আছে, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীতে আছে, ইব্‌সেন-মেটারলিঙ্ক-টলষ্টয়ে আছে, হামসুন-বোয়ার-ওয়েলস্-এ আছে।" কোন কিছু প্রচার করিতে গেলে তাহাকে উপযুক্ত মূর্ত্তিতে সম্মুখে উপস্থিত করান প্রয়োজন—যাহাদের নিকট প্রচার করিতে হইবে তাহাদের

মনের সংবাদও প্রচারককে রাখিতে হইবে। শরৎচন্দ্র আমাদের মনের সংবাদ রাখিতেন, তাই আমাদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ চিত্রই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্কিম শৈবলিনীর দৈহিক শুদ্ধতা বজায় রাখিয়াছেন তাহাকে সমাজে স্থান দিবার জন্য—রবীন্দ্রনাথ মানুষের শুভবুদ্ধির কথা স্মরণ করিয়াই দেহকে রক্ষা করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। শরৎচন্দ্র আমাদের জানিতেন, জানিতেন যে যাহারা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিয়াছে তাহাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি হইবে না —যত দুঃখই তাহারা পাইয়া থাকুক না কেন আমাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিবার শক্তি তাহাদের নাই। অন্নদা দিদির জন্য শ্রীকান্ত, সাবিত্রীর জন্য সতীশ যত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে আমাদের অশ্রু তাহা অপেক্ষা কম ঝরিয়া পড়ে নাই। তাহার কারণ সতীধর্ম্ম বজায় রাখিয়া অন্নদা দিদি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। সাবিত্রী দেহ বিলাইয়া দেয় নাই, সমস্ত প্রলোভনের সহিত লড়াই করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে—মোক্ষদার কথায়, "কোন দিন তার গা ছুঁতে পারলি কি? নিয়ে এসে আজ নয় কাল করে মাস খানেক কাটিয়ে যে দিন বললি, বিয়ে হবে না, সেই দিনই মুখে লাথি মেরে দূর করে দিলে। ছেলে মানুষ, অল্প বুদ্ধি মেয়ে তবু কি, আর কখনো তার ঘরের চৌকাঠ মাড়াতে পারলি।" অভয়া রোহিণীর সহিত বর্ম্মায় গিয়াও স্বামীর নিকট ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহাতে অভয়া-রোহিণীর প্রেমের সম্মান বজায় না থাকিলেও উহাদের উভয়ের মিলিত জীবনের প্রতি আমাদের হৃদয়ের শুভ কামনা কাড়িয়া লওয়া ত' সহজই হইয়াছে। কিরণময়ী উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিয়াছিল—উপেন্দ্রকে আঘাত দিবার জন্য এক হীন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাই তাহার ন্যায় পরম রূপবতী রমণী চিরবুভুক্ষিত হৃদয় লইয়াও আমাদের সহানুভূতি তেমন করিয়া আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমাদের রক্ষণশীল মনের কাছে আবেদন করিতে গিয়াই বোধ হয় শরৎচন্দ্রও এই দিক দিয়া রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ বয়সে 'শেষপ্রশ্ন' ও 'শেষের পরিচয়ে' তিনি নূতন সুর বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হৃদয়কে আমরা এত বড় করিয়া দেখি যে তাহার চপলতা আমরা সহ্য করিতে পারি না। তাই কমল তাহার শুদ্ধাচার সত্বেও আমাদের নিকট যন্ত্রই থাকিয়া গেছে। মোহের সহিত প্রেমের একটা পার্থক্য আমরা করিয়া রাখিয়াছি—কমলের পরিবর্ত্তনশীল প্রেমকে তাই আমরা প্রেম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা। কমলের প্রতি শিবনাথের প্রেমের অবসান হইয়াছিল কিন্তু কমলের কি হইয়াছিল বলিতে পারিনা।

আমাদের বুদ্ধির নিকট কমলের সমস্যা ও কার্য্য একটা আবেদন করিতে পারে বটে কিন্তু আমাদের হৃদয়কে সে স্পর্শ করিতেও পারে না। 'শেষের পরিচয়' শরৎচন্দ্র শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সবিতা নিজের পদস্খলনের কোন কারণ খুঁজিয়া পায় নাই—আমরাও তাহা পাই নাই। যাহাকে অশ্রদ্ধা করি তাহারই সহিত এক যুগ ঘর করা যে কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারিনা। কমল জোর দিয়াছে ভালবাসার উপর তাই তাহাকে বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু সবিতাকে আমরা চিনিতে পারি না। এইখানে একটী কথা স্বতঃই মনে জাগিয়া ওঠে। অন্নদা দিদি কি করিয়া সাহ্‌জীর ঘর করিতেন? কেবল-মাত্র স্বামী বলিয়াই কি তিনি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছিলেন? 'বিয়ের-মন্ত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দিতে পারে, ভক্তি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃত্তিও দিতে পারে'—কিরণময়ীর মুখে এই কথা আমরা শুনিয়াছি। অদৃষ্টে না থাকিলে শান্তি মিলেনা হিন্দুরা এই কথা অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহারা উপদেশ দিয়াছেন, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' কেবলমাত্র কর্ম্মেই অধিকার আছে। অন্নদা দিদিও তাই ফলের চিন্তা করেন নাই—সমাজ যে স্বামীকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে তাহার সেবাকেই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের কোন হাত ছিল না, কিন্তু ইহাও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে নিজে বাছিয়া লইবার মত মন যদি তাঁহার থাকিত তবে তিনি সাহ্‌জীর ছায়াও মাড়াইতেন না। তাই সবিতা স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়া কি করিয়া যে বৎসরের পর বৎসর রমণীবাবুর সহিত কাটাইয়া দিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নর-নারীর যৌন-জীবনে কি হৃদয়ের প্রয়োজন হয় না? যাহাদের হয় না তাহারা সমাজের এক কোণে পড়িয়া আছে, তাহাদের কথা লইয়া আমরা মাথা ঘামাই না। সবিতার যৌন জীবনকে তাই আমরা তাহার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়াই মনে করি—উহাকে নারীজীবনের অন্যতম সমস্যা বলিয়া আমরা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহিনা।

সমাজ ও ব্যক্তিকে শরৎচন্দ্র একেবারে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া দেখিয়াছেন। কেবলমাত্র সমাজের প্রয়োজনেই ব্যক্তি নহে, ব্যক্তির জন্যও সমাজ। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত মানুষের মনও পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে—সমাজকেও ইহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। দশম শতাব্দীর সমাজের সহিত বিংশ

শতাব্দীর মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে গেলে সমাজ ও মানুষ উভয়েরই ধ্বংস অনিবার্য্য। শেষ প্রশ্ন, শেষের পরিচয় লেখা সত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে বুদ্ধির ঘায়ে সমাজের দৃঢ়বদ্ধ শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার পক্ষপাতী শরৎচন্দ্র নহেন। হৃদয়ের স্পর্শে শৃঙ্খলের গ্রন্থীগুলি আল্‌গা করিয়া দিতেই তিনি চাহিয়াছেন। সাবিত্রী-অন্নদাদিদি-রমা প্রভৃতি সমাজকে মানিয়া নিজেদের হৃদয়ের রক্তে আমাদের রঞ্জিত করিয়াছে এবং এইরূপেই সমাজের নিকট তাহাদের অন্তরের আবেদন পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিরণময়ী-কমল-সবিতার জন্য সমাজ কোনদিন নিজেকে সংশোধন করিবে না—যদি কোনদিন করে তবে সে সাবিত্রীদের স্মরণ করিয়াই করিবে। শরৎচন্দ্র তাহা বুঝিতেন।

তারাশঙ্কর

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' পল্লীর একখানি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি উহার নায়ক-নায়িকা যেন রক্ত মাংসের মানুষদের অনেকখানি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রমা সমাজের ভয়ে রমেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহার মন যেন কোথাও জগতের ধূলাবালির স্পর্শ পায় নাই। রমেশ ত' রক্ত-মাংসের দোষবর্জ্জিত বলিলেও চলে। মনে হয় শরৎচন্দ্র বহুযত্নে ইহাদের ধূলাবালি হইতে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কেবলমাত্র রমা-রমেশই নহে তাঁহার অনেকগুলি প্রধান চরিত্রই রক্ত-মাংসের দোষ হইতে কোন এক মন্ত্রবলে নিজেদের সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াই চলিয়াছে। 'চরিত্রহীনে'র সাবিত্রী নিজের 'হাসির মূল্য বুঝিলেও' এবং মেসের বাবুদের মন বুঝিয়া যখন তখন পান খাইয়া হাসিলেও মহাভারতের সাবিত্রীর ন্যায়ই শুচিশুদ্ধা। তারাশঙ্করে এই অতিরিক্ত আঁটিয়া ধরিবার ব্যবস্থা নাই। তাঁহার চরিত্রগুলি আরও সাধারণ। তাঁহার উপন্যাসে আমরা বীরভূমের পল্লীচিত্রের যথাযথ রূপটী দেখিয়াছি—কাহার-বাগদী-মুসলমান এবং সাঁওতাল চাষীদের পাইয়াছি আর পাইয়াছি যাযাবর ঝুমুরের দল। তাহাদের সমাজে দেহশুদ্ধ রাখিবার দিকে এত প্রখর দৃষ্টি নাই, অপরদিকে ধর্ম্মভীরুও তাহাদের ন্যায় কমই দেখা যায়। তাঁহার আদর্শ চরিত্র 'গণদেবতা'র দেবনাথ ঘোষ প্রায় পল্লী-সমাজের রমেশ হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তারাশঙ্কর তাহাকেও ধূলাবালির ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখিলেন না। 'পঞ্চগ্রামে' তাহাকে তিনি সমাজের পাঁচজনের একজন করিয়া দিলেন। তাই দেবু আবার পাঠশালা বসাইবে স্থির করিল, রীতিমত পয়সা লইয়াই সে পাঠ দিবে—বিলুর শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য স্বর্ণকে আহ্বানও জানাইল। তাই দেখি তারাশঙ্কর বরাবর মাটির উপর দিয়াই আমাদের লইয়া গিয়াছেন। মানুষের যে-সব অতি সাধারণ ভাবনা-চিন্তা তাঁহার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়িয়াছে সেগুলিকেও বিনা দ্বিধায় অতি সহজেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। সুবাসীর সম্বন্ধে বনওয়ারীর চিন্তার দৃশ্যটা মনে করিয়া দেখি—"চিন্তিত মনেই সে বাবুদের কাছারীর পথ ধরলে। হঠাৎ দাঁড়াল। কাঁকর-পাথরের পথ। কয়েকটা

কাঁকর-পাথর তুলে নিয়ে গুণতে গুণতে চলল। বিজোড় যদি হয়, তবে পথের ছাতিম পাতার সঙ্গে সুবাসীর মাথায় গোঁজা ছাতিম ফুলের কোন সম্বন্ধ নাই—জোড় হ'লে আছে। এক দুই তিন, সাত আট নয়—বিজোড়। আর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পথের ধারে একটা মোটা পাথর দেখে সে আবার দাঁড়াল। হাতের একটা পাথর নিয়ে ছুঁড়লে। ওই পাথরটায় লাগলে সুবাসীর দোষ নাই। না লাগলে নিশ্চয়ই দোষ আছে। লাগল ঠিক। আবার ছুঁড়লে। এবারও লাগল। আবার ছুঁড়লে। বার-বার—তিনবার। এবার লাগলে বনওয়ারীর আর কোন সন্দেহ থাকবে না। এবার ঠিক লাগল না। তবে খুব কাছেই গিয়ে পড়ল। বনওয়ারী এগিয়ে এসে ঝুঁকে দেখলে। নাঃ, ঠিকই লেগেছে। টুই করে না লাগুক, আস্তে 'সন্তপনে' লেগেছে। যাক, বনওয়ারীর আর সন্দেহ নাই।" (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)। এমনি ছোট ছোট ভাবনা-চিন্তাগুলিকেও ফুটাইয়া তুলিয়া নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তারাশঙ্কর একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন—চরিত্রগুলিও বোধ হয় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। মোহিতলালের কথায় বলিতে পারি, "এই লেখক যে অঞ্চলের, যে-সমাজের-জীবনকে তাঁহার রসসৃষ্টির উপাদান করিয়াছেন, তাহার সেই মাটি তিনি দুই হাতে ছানিয়াছেন; তাহার কঠিন ও কোমল অংশ, তাহার বালি ও কাঁকর তিনি তাঁহার অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন; অর্থাৎ, তাঁহার গল্পসৃষ্টির সেই উপাদান, তিনি বই পড়িয়া, নানা তথ্য, তত্ত্ব ও কল্পনাবস্তু সংকলন করিয়া তৈয়ার করিয়া লন নাই; ওই মাটিকেই তিনি চিনিয়াছেন—সেই মাটির ধর্ম্মকে, তাহারই তলদেশের নিগূঢ় রসধারাকে নিজ হৃদয়ে পূর্ণ অনুভব করিয়াছেন; তাই তাঁহার গল্প, গল্পের চরিত্র এবং তাহার পটভূমি ও মৃৎবেদিকা—প্রকৃতি, সমাজ ও মানুষ—এমনই এক-ধাতুময় হইয়া উঠে যে, সকলেই সেই এক জীবনের অঙ্গাঙ্গী বলিয়া বোধ হয়।"

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ককে তারাশঙ্কর ফলের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধের মত করিয়া দেখিয়াছেন। মানুষগুলি সমাজ-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষে ফল ত' ধরিয়াছে অজস্র কিন্তু সব কয়টাই কি পুষ্টিলাভ করিতে পারিবে? কোনটা বা ঝরিয়া পড়ে কসি অবস্থায়, কোনটায় শিল পড়িয়া পচিয়া ওঠে, কোনটা পোকায় ধরে—কোন কোনটা একটু দ্রুত রঙ ধরিয়া পাকিয়া ওঠে। দেবু-দুর্গা-পদ্ম-শ্রীহরি-

ইরসাদ-রহম-জগন ডাক্তার-পাখী-করালী-বসন্ত-কবিয়াল ইহারা সবাই সমাজবৃক্ষে বিভিন্ন আকৃতির বোঁটায় ঝুলিয়া রহিয়াছে—কোনটা অকালেই খসিয়া পড়িয়া শৃগালের পেটে যাইবে, কোনটা বা দেবতার ভোগে লাগিবে। কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই সজীব—নিজের নিজের গণ্ডীর মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহারা আমাদের মনে দাগ কাটিয়া যায়। ইহাদের কেহই টাইপ চরিত্র হইয়া ওঠে নাই। ভাল-মন্দ সর্ব্বপ্রকার গুণেই তাহারা প্রত্যেকেই বিভূষিত। পঞ্চগ্রামে দরিদ্র সাধারণ শ্রীহরির নিকট দাসখত লিখিয়া দিয়াও দেবুকে ভুলিতে পারে না—দেবুকে পতিত করিয়াও তাহাকে ছাড়িতে পারে না—"দেশের গেজেট দেবু পণ্ডিতের নামে জয় জয়াকার করিয়াছে, দায়ে পড়িয়া শ্রীহরির মতেই তাহাদিগকে মত দিতে হইবে; তবুও তাহারা খুশী হইল। বারবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল—হ্যাঁ তা' বটে। ঠিক কথাই লিখেছে। এর মধ্যে মিথ্যা কিছু নাই। দশের দুঃখে দুঃখী, দশের সুখে সুখী—দেবু তো আমাদের সন্নেসী!" দেশের অসহায় জনসাধারণের সহজ রূপটা তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন এইরূপ অতি সহজে। দেবতা এবং দেবতার বিশেষ দয়ায় পুষ্ট মানুষগুলির দিকে চাহিয়া থাকিয়াই ইহাদের সময় কাটিয়া যায়। দেবতার প্রতিভূ জমিদার—ইঁহাদের নিকট হাত পাতিয়া দান গ্রহণ করাই ত' তাহাদের ললাটলিপি, এই 'লিখনের' জন্য তাহাদের ক্ষোভও কিছু নাই। সকলকেই ইহারা প্রাপ্য সম্মান দিয়া থাকে। জড় মৃত্তিকাকে পর্য্যন্ত ইহারা মাতা বলিয়া মনে করে—দুগ্ধ দিয়া পালন করেন মাতা, শস্য দিয়া ভূমি। সুতরাং ভূমি মাতা বই কি! কেহ এই ভূমির বিরুদ্ধে কথা বলিলে তাহারা প্রথমে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, তারপর অপরাধের কল্পনায় দেবরোষের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইয়া ফেরে। এই মাটী মায়ের অঙ্গে চোট্ দিবার পূর্ব্বে কত কথাই না তাহাদের ভাবিতে হয়! "বনওয়ারী এসে গড় হয়ে ব'সে প্রণাম করলে—'আচোটা মাটিকে' অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মার্জ্জনা করছি। সেবা করছি' তোমার। তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে অচলা হয়ে থেকো। তারপর সে কোঁচড় থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে—বাবাঠাকুরের পুজার ফুল। জয় বাবা তুমি অক্ষে কর। যেন পাথর না বার হয়। যেন জন্তু-জানোয়ার না বার হয়। হাতে তালি দিয়ে বললে—কীট-পতঙ্গ, সাপ-খোপ, সাবধান, তোমরা স'রে যাও। আমি আজার কাছে জমি নিয়েছি, দেবতার কাছে আদেশ—এই জমি আমি কাটাব।" (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)।

শৈবলিনীর স্বামী ত্যাগ করিয়া যাওয়া যে অন্যায় হইয়াছে তাহা বঙ্কিম দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তাই নিজের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি চন্দ্রশেখরকে করিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত। এমন স্বামীকে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমরা স্বতঃই যেন শৈবলিনীর উপর বিরূপ হইয়া উঠি। ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র। তাই অভয়া যে স্বামীকে ত্যাগ করিয়াছিল সে স্বামী 'বর্ষার জঙ্গল হইতে সদ্য বাহির হইয়া আসা বন্য মহিষের' ন্যায়। স্বতঃই অভয়ার প্রতি আমাদের মন সহানুভূতিতে ভরিয়া যাইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সমস্যাগুলি এত সহজ হইয়া দেখা দেয় না। 'পঞ্চগ্রামে'র পদ্ম অনিরুদ্ধের জন্য বসিয়া থাকে নাই বলিয়া আমাদের মনে কোন ক্ষোভ জাগে নাই, কারণ অপরাধের বিচারে তুলাদণ্ডের পাল্লাটা অনিরুদ্ধের দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু 'কবির' ঠাকুরঝির বেলায় ? নিতাই কবিয়ালের প্রতি ঠাকুরঝির আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক—অপরদিকে, ঠাকুরঝির স্বামীও তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে। সমস্যা এইখানে বড়ই জটিল—মাটীর পৃথিবীতে সমস্যাগুলি সত্যই জটিল হইয়া দেখা দেয়। নিজ মনোমত সমাধান করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষায় তারাশঙ্কর সমস্যাগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে সহজ করিয়া তুলেন নাই। কোন সমাধানের ইঙ্গিত করিতে চাহেন নাই বলিয়াই সমস্যাগুলিকে তিনি যথাযথরূপে দেখাইতে পারিয়াছেন। তারাশঙ্করের বসন্ত-দুর্গা-সারি-ষোড়শী দেহের দিক দিয়া অশুদ্ধ হইলেও তাহাদের আমরা অপবিত্র বলিয়া দূরে ঠেলিয়া দিতে পারি কি? 'বিড়ালে' চোরের প্রতি যেমন বঙ্কিম আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন—বসন্-দুর্গাও তেমনি অতি সহজেই আমাদের স্নেহ লাভ করিয়াছে। তারাশঙ্কর ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করান নাই—মেয়েগুলি তাহাদের জীবন্ত মনের ছাপ মারিয়া দিয়াছে আমাদের মনে। প্রয়োজনের তাগিদে অথবা কিছুই না পাইয়া জীবনটাকে ধ্বংশ করিয়া ফেলিবার জন্য ইহারা কর্দ্দমে পা দিয়াছে। সেই পঙ্ক গায়ে মাথায় না লাগিয়াছে এমন নয় কিন্তু তাহারই ভিতর হইতে পঙ্কজের মিষ্ট গন্ধও যে ছড়াইয়া পড়িতেছে! এই গন্ধ সকলের কাছে ধরা না পড়িলেও দেবু, নিতাই কবিয়াল এবং কাশীর বউ-এর কাছে ত' ধরা পড়িয়া গিয়াছেই—আমরাও তাহা হইতে বঞ্চিত হই নাই।

সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের শেষ নাই, মানুষের আনাগোনাও চলিয়াছে সেই আদিকাল হইতেই। এক সমাজ-বৃক্ষ ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে আবার

ঠিক তাহারই পার্শ্বে ধীরে ধীরে ডাল পালা মেলিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে নূতন সমাজ-বৃক্ষ। একটী ফল অতিরিক্ত রস টানিতে গিয়া অন্যগুলিকে শুকাইয়া দিতেছে এবং তাহারই ফলে সমস্ত বৃক্ষটাই শুকাইয়া উঠিতেছে। পেটের তাগিদে বসনের দল দেশে দেশে ঝুমুর গাহিয়া বেড়ায়, অশ্লীল ভঙ্গীতে নাচে, গান গায় এবং দর্শকদের চোখে নেশার ঘোর লাগাইয়া দেয়। তারপর আত্মবিক্রয় করিয়া অন্ন সংস্থান করে আর সেই সঙ্গে গ্রহণ করে বিভিন্ন মানুষের রোগ এবং সেই রোগে ভুগিয়াই একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সমাজ-বৃক্ষের শিকড়ে কোথায় যেন পোকা ধরিয়াছে—কুরিয়া কুরিয়া তাহারা শিকড়টা নিঃশেষ করিয়া আনিতেছে। আমাদের সমাজ এমনি করিয়াই মরিতে বসিয়াছে। কতকটা নির্লিপ্ত ভঙ্গীতেই তারাশঙ্কর এই চিত্র আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

তারাশঙ্করের লেখনীতে বিশেষ করিয়া দেখিতে পাই পতনোন্মুখ সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজের চিত্র—ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠা সমাজ ব্যবস্থার সহিত টক্কর দিতে গিয়া কি করিয়া তাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছে। কালিন্দীতে কলওয়ালা বিমলবাবুর সহিত সংঘর্ষে পরাজিত হইলেন জমিদার ইন্দ্ররায় ও রামেশ্বর চৌধুরী। যে সাঁওতালরা লাঙল ছাড়িতে চাহেনা তাহারা গরু-মহিষ এবং সামান্য মোটঘাট লইয়া বাহির হইয়া পড়িল পথে, অন্য কোন জমিদারের আশ্রয় চায় তাহারা—চরের সোনা ফলান মাটীর উপর গড়িয়া উঠিল সুরকির কল আর কুলি কোয়ার্টার, একদল চাষী পরিণত হইয়া গেল মজুর শ্রেণীতে। 'পঞ্চগ্রামে'ও দেখিতেছি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে চাষীদের সমাজ, অভাব-অনটন প্রবেশ করিয়াছে দরিদ্র চাষীর কুটীরে। মরণের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া শান্ত ধর্ম্মভীরু মানুষগুলি আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। "পেট-দুষমনের ভার কেহ নাও, পেট পুরিয়া খাইতে পাইবার ব্যবস্থা কর,—দেখ তাহারা কি না পারে!" দেবুও তাই শান্ত ভাবে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করে, "উহারা যদি নিজে হইতে বাঁচিবার পথ না পায়, তবে কাহারও সাধ্য নাই উহাদের বাঁচাইয়া রাখে। তাহার চেয়ে অনিরুদ্ধের পথই শ্রেয়। এপথে অন্ততঃ তাহারা পেটে খাইয়া, গায়ে পরিয়া—এখানকার চেয়ে ভালভাবে থাকিবে। একটা বিষয়ে পূর্ব্বে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল। কলে খাটিতে গেলে—মেয়েদের ধর্ম্ম থাকিবে না; পুরুষেরাও মাতাল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। কিন্তু কাল সে ভাবিয়া দেখিয়াছে—ও আশঙ্কাটা অমূলক না হইলেও, যতখানি গুরুত্ব সে তাহার উপর আরোপ

করিয়াছে ততখানি নয়। গায়ে থাকিয়াও তো উহাদের ধর্ম্ম খুব বজায় আছে! মনে পড়িয়াছে—শ্রীহরির কথা, কঙ্কনার বাবুদের কথা, হরেন ঘোষালের কথা;* * *।" সমাজ একটী অখণ্ড জীবন্ত পদার্থ—যে-সমাজে কেবল একতরফা কর্ত্তব্য করাইয়া লইবার চেষ্টা চলে সে-সমাজ কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না। সকলের কর্ত্তব্যের সমষ্টিই ইহাকে গতিদান করে। নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা না খাইয়াও ধর্ম্ম করুক, জমিদার বেশী খাইয়াও শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করুক—তথাপি কোন ক্ষতি নাই বলিলে ত' চলিবে না। একটী পরিবারে বড় ভাই ছোট ভাই নিশ্চয়ই থাকে—সকলেই কিছু একসঙ্গে জন্মায় না। পরিবার একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে পারে ততদিনই যতদিন প্রত্যেকটী ভাই নিজ নিজ কর্ত্তব্য করে। বড় ভাই যেদিন ছোট ভাইকে স্নেহ করিবে না সেইদিন হইতেই সেও ছোট ভাইয়ের শ্রদ্ধা হারাইবে।

এই পতনোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কথা তারাশঙ্কর বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য়। দুইটী চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা রূপকের আকারেই ধনতন্ত্রের আওতায় বৰ্দ্ধিত সমাজব্যবস্থার উত্থানের কথা আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছে। "'ওই বুড়োর কথা মানিস না' বলতেই সে (বনওয়ারী) সচেতন হয়ে রাগে ফেটে পড়বার মত হয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—খবরদার! সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে করালীর সামনে এসে খপ ক'রে চেপে ধরলে তার লম্বা চুলের মুঠো। চুলের মুঠো ধরে সে তার মাথাটা টানতে লাগল মাটির দিকে। টেনে মাটিতে তার মাথাটা ঠেকিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেবে, এমন ক'রে মাথা ঝাঁকি দিয়ে কপালে চোখ তুলে কাহারপাড়ার বনওয়ারী মাতব্বরের সঙ্গে কথা বলার আইন নাই, বললে মাথা এমনিভাবে মাটিতে ঠেকে যায়। নিষ্ঠুর আকর্ষণে টানতে লাগল বনওয়ারী। কিন্তু করালী চন্নপুরের কারখানায় কাজ করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা ভুলে গিয়ে সোজা মাথায় সেলাম করা অভ্যাস করেছে, তার ওপর সেও লম্বা-চওড়া জোয়ান, গাঁইতি-হাতুড়ি পিটে শরীর হয়েছে পাথরের মত শক্ত; করালী যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও ঘাড় শক্ত ক'রে মাথা সোজা ক'রে রাখলে, কিছুতেই নোয়াবে না সে তার মাথা।" সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বৃদ্ধ হইয়াই ত' উঠিয়াছে, ভাঙ্গিয়া পড়িবার শেষ মুহূর্ত্তে সে ধনতান্ত্রিক যুগের সমাজের মাথাটা মাটিতে নোয়াইয়া দিতেই চায় কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ

হইয়া যায় বনওয়ারীর চেষ্টার মতই—করালীর মত ধনতান্ত্রিক যুগের সমাজ ঘাড় সোজা করিয়াই থাকে। দ্বিতীয় চিত্রটী দেখি বনওয়ারী-করালীর লড়াইয়ের দৃশ্যে—"কয়েক মুহূর্ত্ত দুজনে শুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুজনের দিকে চেয়ে। সামলে নিলে যন্ত্রণা। তারা পরস্পরের দিকে ছুটে এল বুনো মহিষের মত। বুনো দাঁতালের মত পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রমণে জড়িয়ে ধ'রে পড়ল মাটির উপর, ওই গাছতলার অন্ধকারের মধ্যে। নখ, দাঁত, কিল, চড়, ঘুষি। হাঁসুলী'র বাঁকের বাঁশবনের ছায়ার একদিন যুদ্ধটা শুরু হয়েও শেষ হয় নাই। আজ শেষ না ক'রে ছাড়বে না বনওয়ারী। হাঁসুলীর বাঁকের বাঁশবনের অন্ধকার আকাশ বেয়ে ভেসে এসে ওই ঝাঁকড়া গাছটার শাখাপল্লব থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে নেমে ওদের দুজনকে ঘিরে গভীর হতে লাগল। নিষ্ঠুর প্রহারের শব্দ, হিংস্র গর্জ্জন, কাতর মৃদু স্বর শোনা যাচ্ছে শুধু।" এ যুদ্ধে জয় হবে কাহার? এতদিনকার শক্তিশালী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ—পাখীর ধারণা জয়লাভ করিবে সেই। কিন্তু টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিল কে? "কতক্ষণ কে জানে! তবে অনেকক্ষণ। অন্ধকারের মধ্যে একটা মূর্ত্তি উঠে দাঁড়াল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। একজন পড়ে রয়েছে অসাড় ভাবে। * * * হা-হা-হা-হা ক'রে হেসে উঠল করালী।" বৃদ্ধ সমাজের কাঠামোটা শেষ পর্য্যন্ত চুরমার হইয়া গেল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘষিয়া তারাশঙ্কর যথাযথ চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিও ধূলাবালির পৃথিবী ছাড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। তবে কি তারাশঙ্করের উপন্যাসে কোন আদর্শই ফুটিয়া ওঠে নাই? আইডিয়ালিজ্‌ম্ ও রিয়ালিজ্‌ম্-এর আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে নিছক বাস্তববাদ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না—রচনার মধ্যে লেখকের জীবন-দর্শনের ছাপ পড়িতে বাধ্য। তারাশঙ্করের লেখনীতে ইহা কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে? তাঁহার চরিত্রগুলি আদর্শ হইয়া উঠিয়া রক্ত-মাংস শূন্য হইয়া না পড়িলেও তাঁহার সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে গল্পের ভিতর দিয়াই আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত গল্পটা যেন কোন এক বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতে চায়। পাষাণপুরী, আগুন, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পদচিহ্ন ইহারা প্রত্যেকেই

যেন এক একটা জীবন্ত মানুষের মত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া এক একটা বিশেষ দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে চাহিতেছে। সমাজের প্রাণরস শুকাইয়া উঠিতেছে কেন? মানুষের গতিই বা কোনদিকে? চন্দ্রনাথ-হীরু কি না পাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—যাযাবরী কি পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃঢ়বদ্ধ সমাজের শান্তিময় ক্রোড় কিসের অভাবে চিড় খাইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে—দেবু পণ্ডিত কোন পথ না পাইয়া চাষীদের বাঁচিয়া যাইবার উপায় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহারও গভীরে রহিয়াছে তাহার কত বড় বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস তাহা ত' আমাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে না। সামান্য ঝুমুর দলের মেয়ে বসনের মৃত্যুর কারণই বা কি—স্বৈরিণীর অন্তরের অন্তরেও কিসের স্পর্শে নির্ম্মল প্রেম টলমল করিয়া ওঠে তাহাও আমাদের স্পর্শ করিয়া যায়। বনওয়ারী পরাজিত হইয়াও যেন আমাদের জয় করিয়া লয়। তারাশঙ্কর চমকপ্রদ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া আমাদের উচ্চ আদর্শের সন্ধান দেন নাই—গল্পের জালের মধ্যে আমাদের বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

(সমাপ্ত)

BAGHBAZ R RE DING L
CAL